GB.

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

রবীন্দ্রনাথ

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

এম-এ, এম-এ (অনার্স), বি-এল

কলিকাতা
১৩৫৮

কুলজা সাহিত্য-মন্দির
১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সোল এজেন্ট :
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকা

মাসপয়লা প্রেস
১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

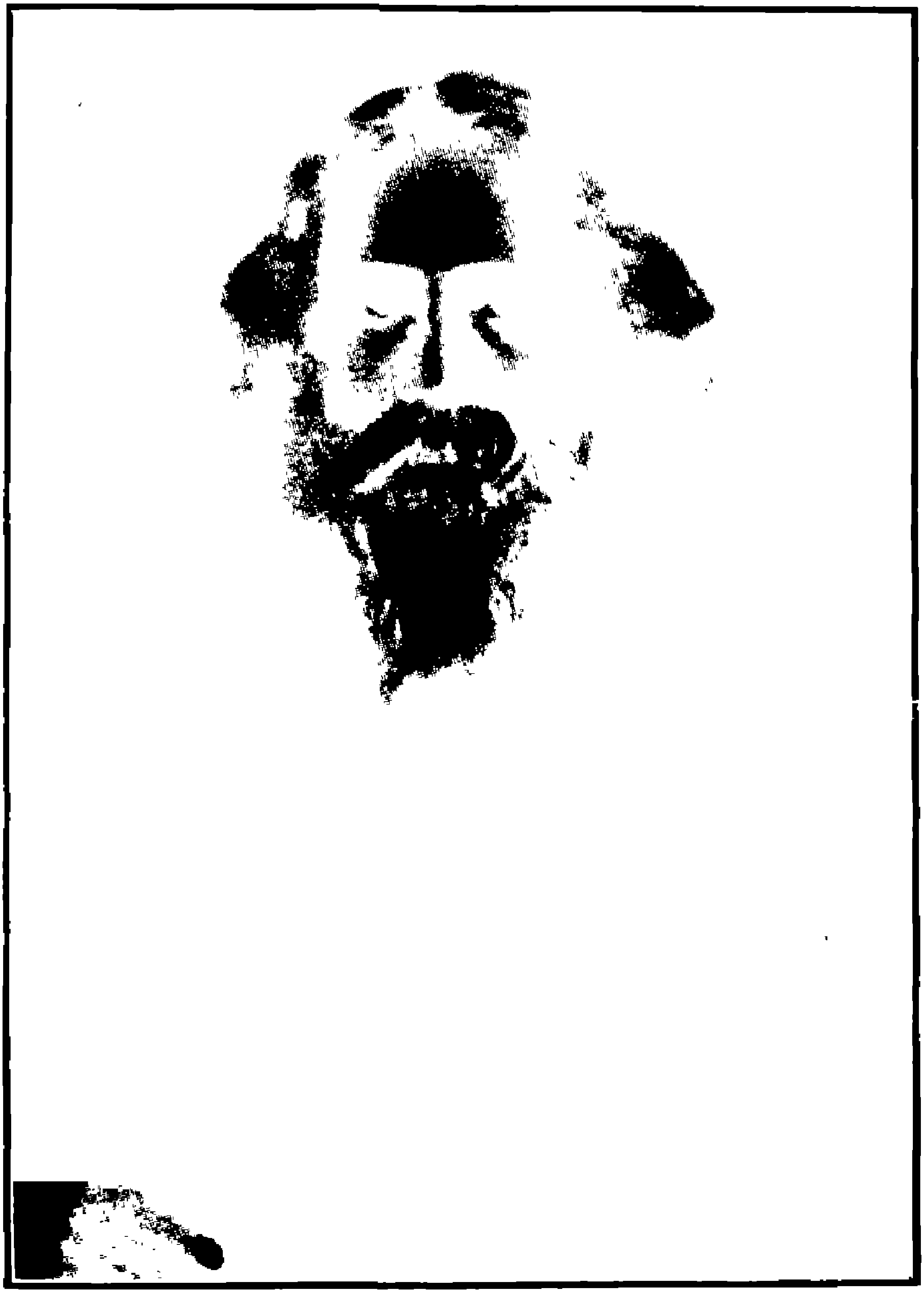

উদিত

বৈশাখীপূর্ণিমা

১২৬৮

অস্তমিত

রাখীপূর্ণিমা

১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ

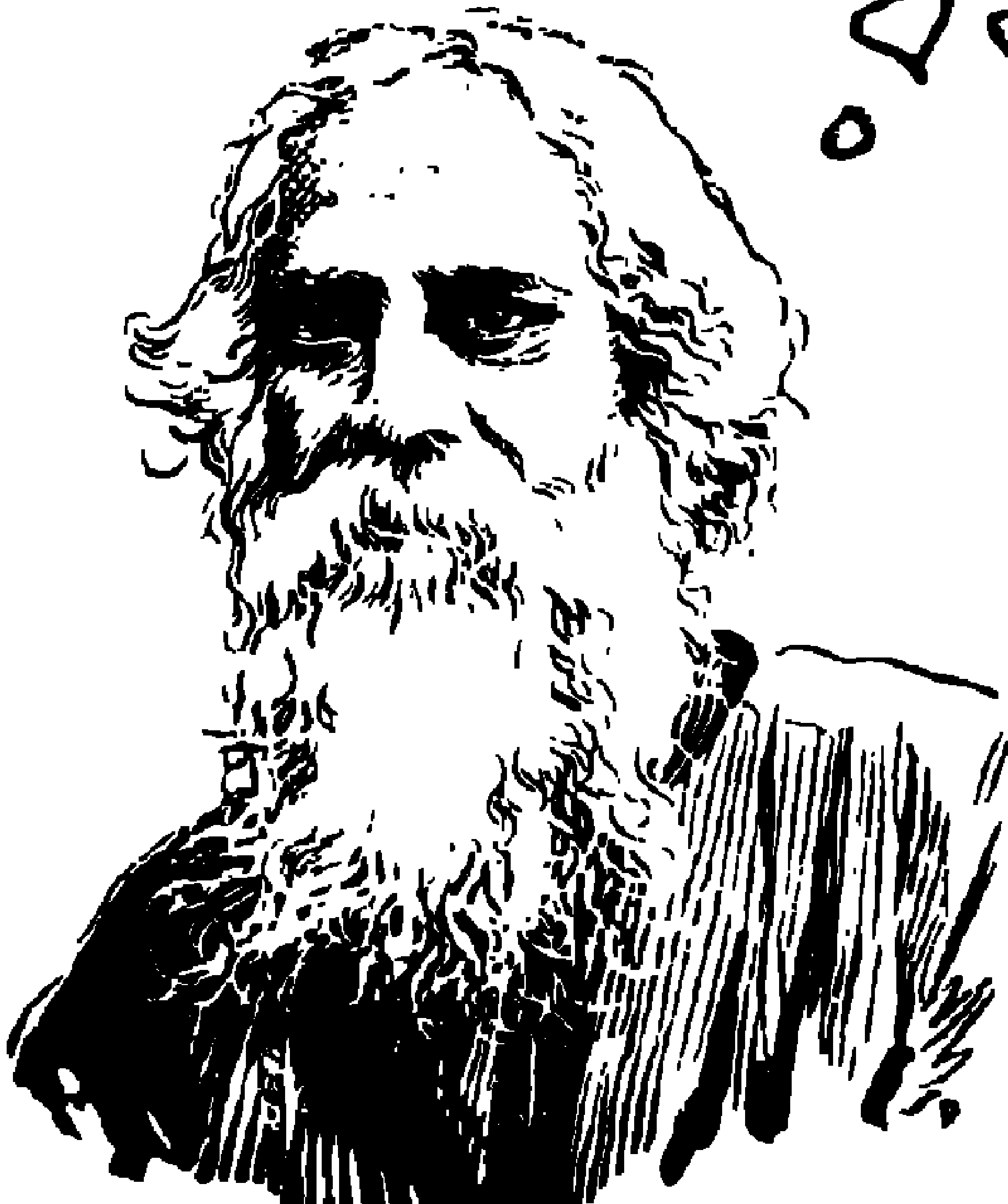

কলিকাতায় ৬নং দ্বারকা-নাথ ঠাকুর লেনের পৈত্রিক বাসভবনে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে মঙ্গলবার রাত্রি আড়াই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশ সন্তান এবং নবম পুত্র।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ভর্ত্তি হন জোড়াসাঁকোর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে। অল্পদিন পরেই তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ত্যাগ করিয়া নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। অতঃপর তিনি বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন গৃহশিক্ষকদের নিকট। পদার্থ বিদ্যা, জ্যামিতি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, শরীরতত্ত্ব, সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ছিল তাঁর পঠিতব্য বিষয়। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন এবং দেহচর্চ্চার জন্য কুস্তি ও ব্যায়াম করিতেন। ১৮৬৮ সালে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কবিতা রচনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। কবিতার নাম 'অভিলাষ' এবং উহাতে রচয়িতার নাম ছিল না, শুধু এইটুকু উল্লেখ

ছিল যে উহা ১২ বৎসর বয়স্ক বালকের রচনা। বেঙ্গল একাডেমিতেও তিনি কিছুদিন অধ্যয়ন করেন।

১৮৬৩ সালে বোলপুরের নিকট ২০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া মহর্ষি সেখানে শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত সেখানে গিয়া থাকিতেন। ১৮৭৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁর উপনয়ন সম্পন্ন হয় কলিকাতার বাসভবনে। উপনয়নের পর তিনি পিতার সহিত ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভর্তি হন সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে।

১৮৭৫ সালের ৮ই মার্চ্চ রবীন্দ্রনাথের জননী সারদা দেবী পরলোক গমন করেন। কবির বয়স তখন ১৩ বৎসর ১০ মাস।

স্বনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায়। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল, এবং ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ রচনাই উহাতে প্রকাশিত হইত। কবিতাটি লিখিত হয় হিন্দু মেলা উপলক্ষে, এবং ঐ বৎসরের ১১ই ফেব্রুয়ারী উহা মেলাক্ষেত্রে পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন গৃহশিক্ষকদের নিকট সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য ও নাটক পড়িতেন। সংস্কৃতে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা এবং ইংরেজীতে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাবলী তিনি বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। শেক্‌স্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকটি তিনি বাঙ্গলা কবিতায় ভাষান্তরিত করেন। ১৮৮০-৮১ সালের ভারতীতে উহার কতকাংশ প্রকাশিতও হয়। এই সময় তিনি ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন এবং 'বনফুল' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। এই কবিতাটি ১৮৭৬

সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভানুসিংহ ঠাকুর এই ছদ্ম নামে এই সময় হইতেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে গীতি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ সালে পুনরায় তিনি পিতার সহিত ভ্রমণে বহির্গত হন এবং কিছুদিন হিমালয় অঞ্চলে যাপন করেন।

অভিনয়

কলিকাতায় ফিরিবার পর তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিত 'অলীক বাবু' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয় হইয়াছিল তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাসভবনে। ইহা তাঁহার প্রথম অভিনয় নহে। ইতিপূর্বে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা একটি গীতি প্রধান নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন। উহার জন্য কয়েকটি গানও তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮০ সালে এই নাটকটি 'মানময়ী' নামে প্রকাশিত হয়।

ভারতীর নিয়মিত লেখক

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত মাসিক ভারতীতে ১৬ বৎসর বয়স হইতেই তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম রচনাবলীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা, বড় গল্প 'ভিখারিণী', দীর্ঘ কবিতা 'কবি কাহিনী' এবং উপন্যাস 'করুণা' উল্লেখযোগ্য। 'করুণা' অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ইহা ছাড়া ভারতীতে তিনি ইংরেজদের আদবকায়দা, এংলো স্যাক্সন জাতি এবং এংলো স্যাক্সন সাহিত্য, বিয়াত্রিচে ও দান্তে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের

কবিতা পুস্তকের সমালোচনা করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি লর্ড লিটনের দিল্লী দরবার উপলক্ষে একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা লেখেন এবং হিন্দু-মেলায় উহা পাঠ করেন। কবিতাটি পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়েই তিনি ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য মেজ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট গমন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস, তিনি তখন ছিলেন আহমদাবাদের জেলা জজ।

বিলাত যাত্রা

১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সত্যেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে গিয়া তিনি ব্রাইটনে স্কুলে ভর্ত্তি হন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ তখন ব্রাইটনে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের সহিত থাকিতেন। সেখান হইতে তারকনাথ পালিতের সহিত তিনি লণ্ডনে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরী মর্লির নিকট ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। লণ্ডনে প্রথমে তিনি ছিলেন তাঁহার ল্যাটিন শিক্ষকের নিকট, তৎপরে কিছুদিন অধ্যাপক বার্কার এবং ডাঃ স্কটের নিকটেও ছিলেন। লণ্ডনে অবস্থান কালে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন এবং সময় পাইলেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গমন করিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মী গ্লাডষ্টোন এবং ব্রাইট তখন জীবিত; ইঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য একদিন তিনি হাউস অফ কমন্সে গমন করেন।

বিলাতে গিয়া কবি বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা বন্ধ করেন নাই। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক 'কবি কাহিনী'

প্রকাশিত হয়। বিলাত হইতে তিনি ভারতীতে নিয়মিত লেখা পাঠাইতেন। ভারতীতে প্রকাশিত এই সময়কার রচনাবলীর মধ্যে কবিতা 'ভগ্নতরী' এবং 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। 'ভগ্ন হৃদয়' শীর্ষক গল্প কবিতাও এই সময়েই ভারতীতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'ভগ্ন-হৃদয়' পরে ১৮৮১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন।

বাল্মীকি প্রতিভা ও কাল মৃগয়া অভিনয়

দেশে ফিরিয়া তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কাল মৃগয়া' এই দুখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। জোড়াসাঁকোর বাটীতে দুইখানি নাটকের অভিনয় হয় এবং দুখানিতেই তিনি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয় ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, এবং 'কাল মৃগয়া' অভিনীত হয় পর বৎসর ২৩শে ডিসেম্বর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন ১৮৮১ সালের মে মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বক্তৃতা গৃহে। বক্তৃতার বিষয় ছিল সঙ্গীত ও ভাবের অভিব্যক্তি। বেথুন সোসাইটি এই সভার উদ্যোক্তা এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ মাসেই আইন পড়িবার জন্য কবি পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার আর আইনজীবী হওয়া হইল না। মহর্ষি তখন ছিলেন মুসৌরিতে, তিনি সেখানে চলিয়া যান। ১৮৮২ সালে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন বাস করিতেন চন্দননগরে, তিনি সেখানে আসিয়া কিছুদিন থাকেন এবং কবিতা রচনা ও সঙ্গীত চর্চ্চা করেন।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

কলিকাতায় ফিরিয়া কবি এবার থাকেন ১০নং সাডার ষ্ট্রীটে। এই বাড়ীতে তিনি তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা করেন ১৮৮৩ সালে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' তাঁহার কবিচিত্ত গাহিয়া ওঠে—

"আজি এ-প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
...
আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিব রে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।

...

আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান ;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে-গান করিব শেষ।

ওরে চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাতে কর্।

ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা করেন কবি তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিবাহ

১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর যশোহরের বেণী রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত কবির বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিতর্ক

১৮৮৪ সালে হিন্দুধর্মের আদর্শ লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার এক বিতর্ক হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রে যাহা লিখিতেন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে তাহার উত্তর দিতেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

'বালক' পরিচালনা

১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি শিশুদের জন্য পরিচালিত মাসিক 'বালকে'র ভার গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন উহার সম্পাদিকা। 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও গল্প 'মুকুট' বালকের জন্য লিখিত হয় এবং উহাতে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই তাঁহার সঙ্গীতগুলি 'রবি-ছায়া' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ পুস্তক 'আলোচনা' এবং কবিতাপুস্তক 'শৈশব সঙ্গীত' এই সময় প্রকাশিত হয়। শৈশব সঙ্গীতে ১৩ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে পর্য্যন্ত লিখিত রচনাবলী স্থান পাইয়াছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ লইয়া বিতর্ক

১৮৮৬ সালের ২৫শে অক্টোবর তাঁহার প্রথম সন্তান কন্যা মাধুরী-লতার জন্ম হয়। এই সময় ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও মতবাদ লইয়া যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুর সহিত তিনি বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। যোগীন্দ্রচন্দ্র

ছিলেন 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক, বঙ্গবাসীতে ঐ বিষয়ে তাঁহার যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর দিতেন 'সঞ্জীবনী'তে। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি স্বরচিত সঙ্গীত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গান করেন। এই বৎসরেই তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' পুস্তক প্রকাশিত হয়।

হিন্দু বিবাহের আদর্শ লইয়া বিতর্ক

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে সব চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইত মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ফুটিয়া উঠিত। ১৮৮৭ সালে 'চিঠি পত্রে' এইরূপ কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালে 'সমালোচনা' নামক প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি গাজিপুর গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। 'মানসী'র অধিকাংশ কবিতা এখানে রচিত হয়। কলিকাতায় ফিরিয়া এবার তিনি পার্ক ষ্ট্রীটে তাঁহার পিতার সহিত থাকেন। হিন্দু বিবাহের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিত একটি প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের সভায় তিনি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি লিখিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের অনুরোধে, এবং ঐ সভার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। এই প্রবন্ধ পাঠের পর এক তীব্র বিতর্কের উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহাকে সমর্থন করেন। দার্জ্জিলিং-এ কিছুদিন, পৈত্রিক জমিদারী শিলাইদহে কিছুদিন এবং পুনরায় গাজিপুরে কিছুদিন কাটাইয়া আসিবার পর তিনি 'মায়ার খেলা' নামক গীতি-নাট্য রচনা করেন। ঐ-সব স্থানেও তাঁহার বহু কবিতা রচিত হয়।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা রেণুকার জন্ম

১৮৮৮ সালের ২৭শে নবেম্বর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পর বৎসর 'রাজা ও রাণী' নাটক প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালের ৩১শে জানুয়ারী তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার জন্ম হয়।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা

১৮৯০ সালের ২২শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন। লণ্ডন যাওয়ার পথে তিনি ইতালি ও ফ্রান্স হইয়া যান। ঐ বৎসরেরই ৪ঠা নবেম্বর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় পৈত্রিক জমিদারী পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া তাঁহার উপরে পড়ে। শিলাইদহে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। নৌকায় করিয়া বিভিন্ন স্থানের মহাল পরিদর্শনেও তাঁহাকে বহু সময় অতিবাহিত করিতে হইত।

'সাধনা' প্রকাশ

পত্রিকা প্রকাশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সহিত একযোগে তিনি বাংলা মাসিক 'সাধনা' প্রকাশ করেন। সাধনায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও স্থান লাভ করিত এবং উহার প্রায় অর্দ্ধেক লেখাই তাঁহার থাকিত। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' প্রকাশেও তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 'পোষ্ট মাষ্টার' গল্পটি হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়।

প্রজাদের প্রতি সমবেদনা

১৮৯২ সালের ১২ই জানুয়ারী কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম হয়। এই বৎসর উত্তরবঙ্গের ও কটকের জমিদারী পরিদর্শনে তাঁহার অনেক সময়

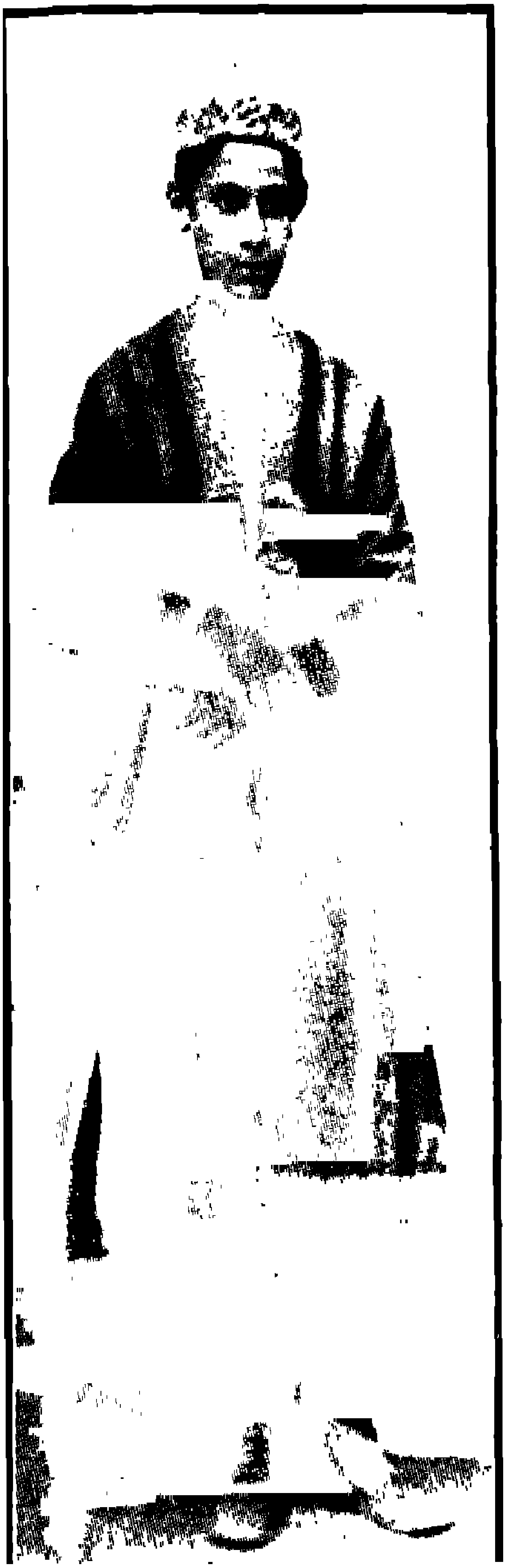

গ্রন্থাগার
ঘোষপাড়া

অতিবাহিত হয়। প্রজাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হয়। এই সময়ে লিখিত 'স্ত্রী মজুর' ও 'কর্ম্মের উমেদার' প্রবন্ধ দুটিতে নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখরে বসিয়াও তিনি যে দরিদ্রকে অবজ্ঞা করেন নাই, তাহাদের বেদনার ইতিহাস তিনি যে অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, এই দুটি প্রবন্ধে তাহার সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে। এই সময়েই তিনি বিখ্যাত ব্যঙ্গ-নাট্য 'গোড়ায় গলদ' লেখেন।

শিক্ষার হেরফের

১৮৯৩ সালে তাঁহার ৩৫২টি কবিতা একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'সোনার তরী' এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ এই সময়কার রচনা। নাটোরে এক সম্মেলনে তিনি 'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গলাভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এই মত সমর্থন করেন।

কবি লেখেন, "যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে ; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই ; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না ; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা,

আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না ; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই ; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা আমাদিগকে কেবল কেরাণীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র।

"এইরূপে জীবনের এক তৃতীয়াংশ কাল যে-শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষা লাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যথার্থ লাভ করিতে পারিব !

"আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে ?—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। আমরা এখন বিধাতার নিকট এই বর চাই, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।"

'পঞ্চভূতের ডায়েরী', 'কাবুলীওয়ালা' এবং 'বিদায় অভিশাপ' এই সময়ে লিখিত হয়। এই বৎসরেই কলিকাতায় চৈতন্য লাইব্রেরীতে এক জনসভায় তিনি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এই প্রবন্ধে কবি লেখেন, "ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠির চিরপালিত গোরুটির 'মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল বিচালি যোগাইতে কোন আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সে জন্য শিং দুটা ঘসিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকেও বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে।...প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজী উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ! তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র! কত বারম্বার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনো মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ীর টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগ্য ভারতবর্ষের কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোনো আভাস মাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাকটিকাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মণ দরে সের দরে টাকার দরে শিকার দরে গৌরব।...স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপরে মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

"সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের

মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্ম বেশ, ছদ্ম নাম, ছদ্ম ব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

"সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা-প্রজার বিদ্বেষ ভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্ত্তব্য সকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষা স্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা পূরাইতে না পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজ সাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

"যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণে নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত কার্য্য সিদ্ধি।"

দেশের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিবার ইচ্ছা তাঁহার এই

সময়কার প্রবন্ধগুলিতে সুস্পষ্ট। চৈতন্য লাইব্রেরীর সভার তিন মাস পর তিনি সাধনাতে 'ইংরেজের আতঙ্ক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। মুসলমান সংহৃতিকে অবজ্ঞা করিবার পরিণাম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেসকে সতর্ক করিয়া দেন।

সুবিচারের অধিকার

বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে গোহত্যা সম্পর্কে দেশে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রতিও তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দেন। সাধনায় প্রকাশিত 'সুবিচারের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেশবাসীর প্রাণে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

কবি লেখেন, "অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।......

"কংগ্রেসের প্রতি গবর্মেণ্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কংগ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোন পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গবর্মেণ্টের সুশাসনে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিবে।......

"এই কারণে গবর্মেণ্ট হিন্দু-মুসলমানের গলাগলি দৃশ্য দেখিবার

জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

"আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুভব করিতেছি।......মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি, আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটেই গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকী আমাদের নিজের গাঁট হইতে দিতে হইবে।

"মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরাজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্ত-সঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপট ভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

"কন্‌গ্রেস অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাতেই ইংরাজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভ কাল হইতে যে হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনও একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্য সে জাতি একত্র হইতে পারে। অতএব সেই সূত্রে যখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতঃই মুসলমানের প্রতিই ইংরাজের দয়া বাড়িয়া গিয়াছিল।

"গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ বা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

"স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাত পরম্পরাকে যদি অর্দ্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

"আমরা জানি বহুকালের পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদন করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশতঃ আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।"

চিত্রার 'উর্ব্বশী' কবিতাটি এই সময়ে রচিত হয়।

এবার ফিরাও মোরে

কাব্যের মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা উপলব্ধি করিবার, মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের অভিব্যক্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিল তাঁহার বিখ্যাত 'এবার ফিরাও

মোরে' কবিতায়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। উদ্বেলিত হৃদয়ে কবি লিখিলেন—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়,
বিজন-বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
রেখো না বসায়ে। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরালসে উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুখ অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে, নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।

কী গাহিবে, কী শুনাবে।—বলো মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি' শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা,
মস্তকে পড়িবে ঝরি'—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধ'রে। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে,

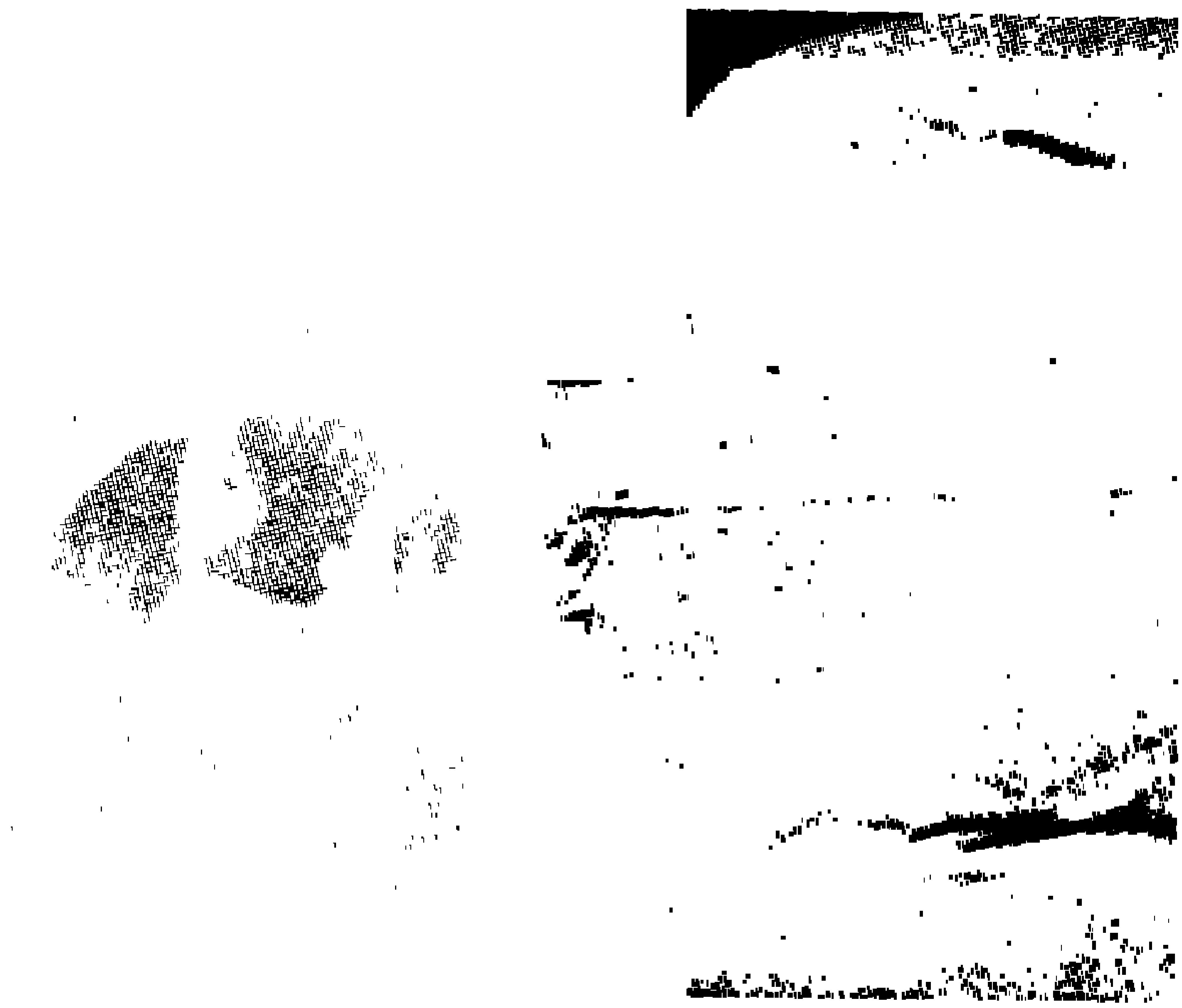

ভতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৩১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী।

শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

শুধু জানি
সে-বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবন কণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্ব জনে।

সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখ নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেম তৃষা।"

অপমানের প্রতিকার

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া লিখিত প্রবন্ধাবলী সাধনায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাহেবদের সম্মুখে ভারতবাসীকে সঙ্কুচিত

হইয়া পড়িতে দেখিলে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন, এই দুর্ব্বলতা ভারতবাসীর মন হইতে দূর করিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে কশাঘাত করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই বৎসরেই, ১৮৯৪ সালে, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সুধীন্দ্রনাথের হাত হইতে সাধনা সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার উপরে আসিয়া পড়ে। শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারীদের উদ্ধত ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁহার সমগ্র অন্তরের বিদ্রোহের জ্বালা ভাষা পায় এই সময়ে রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে এবং 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে।

ইংরেজ কেন ভারতবাসীকে লাঞ্ছনা করিতে সাহস পায় তাহা দেখাইতে গিয়া কবি লেখেন, "আমাদিগের প্রতি কর্ত্তৃ জাতীয়ের এই যে অবজ্ঞা সে জন্য প্রধানত: আমরাই ধিক্কারের যোগ্য। কারণ একথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না—সম্মান নিজের হস্তে।..."

"হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্ব্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্ব্বলতা।...

"এক বাঙালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালী যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না, একথা যখন বাঙালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

"আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্য্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্য্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরাজ ইংরাজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।"

বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা সাধনায় প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনার মান অনেক উন্নত করেন।

বস্ত্র ও পাটের ব্যবসা

১৮৯৪ সালের নবেম্বর মাসে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সাধনার সম্পাদনাভার ত্যাগ করিয়া তিনি এবার পূর্ণোদ্যমে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এক বৎসর পরেই সাধনা বন্ধ হইয়া যায়। ব্যবসায়ে তাঁহার অংশীদার ছিলেন দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। স্বদেশী বস্ত্রের একটি দোকান খুলিয়া কাপড়ের ব্যবসা

এবং সঙ্গে পাটের ব্যবসা তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া আরম্ভ করেন। এই সময়েই রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার লেখনী অগ্নি উদ্গীরণ করিতে থাকে। 'আবদারের আইন' প্রবন্ধটি এই সময়ের রচনা। 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'জীবনদেবতা' ও 'নদী' এই বৎসর রচিত হয়।

১৮৯৬ সালে জমিদারী সংক্রান্ত মামলার তদারকে তাঁহাকে উড়িষ্যা গমন করিতে হয়। অক্টোবর মাসে তাঁহার প্রথম কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গ-নাট্য 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এই সময়কার রচনা।

নাটোর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন

১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে কবি নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি এবং নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সম্মেলনের বক্তৃতা ও প্রস্তাবাবলী ইংরেজীতে না করিয়া বাংলা ভাষায় করিবার জন্য কবি প্রস্তাব করেন। তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই, একমাত্র মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। এক ভীষণ ভূমিকম্পে সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যায়।

ভারতীর ভার গ্রহণ

নাটোর হইতে ফিরিয়া কবি 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'লক্ষীর পরীক্ষা' রচনা করেন। নিউরাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি সাঁওতাল পরগণার কর্মাটারে বায়ু পরিবর্তনের জন্য চলিয়া যান। সেখানেও স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত না হওয়ায় সিমলা যান। শরীর সুস্থ হইবার পর কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি 'ভারতীর' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ

কণ্ঠরোধ

'কেশরী'তে রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের পর তিনি ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্য কলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিলকের মামলা সমর্থনের জন্য অর্থ সংগ্রহের কার্য্যেও তিনি সহায়তা করেন। ১৮৯৮ সালে নূতন সিডিসন বিলের বিরুদ্ধে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়; এই সভায় পঠিত 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কবি লেখেন, ("যদিচ ইংরাজ আমাদের একেশ্বর রাজা এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এদেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতি দূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমান মাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি।) কারণ প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারত লক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়; সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

"বাহিরের প্রবল শত্রু সম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতে পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

"কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্য্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি, যে, বিনা চেষ্টায় বিনা কারণে আমরা

ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ঙ্কর! আশ্চর্য্য! ইহা আমরা পূর্ব্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

"ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!

"একদিকে পুরাতন আইন শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল আবার অন্য-দিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্ম্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে! একটা ভয়ানক ধূম পড়িয়া গেছে! আমরা এতই ভয়ঙ্কর!

"মূল কথাটা এই তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্ব্ব দেশী, তাঁহারা পশ্চিম দেশী। আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া উঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেই জন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করত্বের আর কোনও লক্ষণ নাই কেবল একটি আছে, আমরা অজ্ঞাত।

"সত্য যদি তাহাই হইবে, তবে হে রাজন্‌, আমাদিগকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদেরই নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া ফল কী?

"সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না। সেই নির্ব্বাক নিরক্ষর সংবাদ-পত্রই কি যথার্থ ভয়ঙ্কর নহে?…সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।…রুদ্ধবাক্‌ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা।"

প্লেগে সেবাকার্য্য

১৮৯৮ সালে কলিকাতায় প্লেগ আরম্ভ হয়। ভগিনী নিবেদিতা প্লেগ আক্রান্ত রোগীদের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং রবীন্দ্র-নাথ তাহাতে যোগদান করেন।

ঢাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন

এ বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয় ঢাকায়। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগের পরিচয় এই সম্মেলনেও স্পষ্ট হইয়া উঠে। সভাপতি রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করিয়া সভায় তিনি উহা পাঠ করেন। আসাম ও উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলা ভাষার উচ্ছেদের চেষ্টা তখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, সম্মেলনে তিনি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশীয় ভাষা ও দেশীয় আচার ব্যবহারকে ইংরেজী শিক্ষিত বড় লোকেরা তখন অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন। এই মনোভাবকে সর্ব্বপ্রথম কঠিন আঘাত করিয়া দেশের দিকে তাঁহাদের মন ফিরাইবার চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথ। (কোট বনাম চাপকান, মুখার্জ্জি বনাম ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি

তাঁহার এই সময়কার রচনা। শেষেরটিতে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগ সমর্থন করিয়া রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সাহেবীয়ানাকে তীব্র কশাঘাত করেন। জনৈক এংলো ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর সমাধিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য তখন চাঁদা তোলা এবং চাঁদা দেওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল, সাহেবীয়ানা ফলাও করিবার জন্য জমিদারেরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া এই চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাজটীকা'য় ইঁহাদের এই মনোবৃত্তি সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৩৮ বৎসর।

ব্যবসায় বন্ধ

১৮৯৯ সালে বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলে পাটের ব্যবসায় অচল হইয়া উঠিবার উপক্রম হয়। অসাধু কর্ম্মচারীদের দোষে ক্ষতিও যথেষ্ট হয়। সমস্ত দায় নিজের উপর লইয়া রবীন্দ্রনাথ পাটের ব্যবসা গুটাইয়া ফেলেন। পর বৎসর বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

কথা ও চিরকুমার সভা

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব ও বীরত্বের কাহিনীকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি রাজপুত মারাঠা ও শিখ বীরদের আত্মদানের কাহিনী লইয়া 'কথা' রচনা করেন। 'কাহিনী'ও এই সময়েই রচিত হয় এবং 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয়। ভাগিনেয়ী সরলা দেবী তখন 'ভারতী' সম্পাদিকা। তাঁহার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' লেখেন এবং ভারতীতে উহা প্রকাশিত হয়। শিলাইদহে দিবারাত্র

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনি এই নাটকটি দুই দিনের মধ্যে লিখিয়া শেষ করেন। এই দুই দিন তিনি তরল খাদ্য ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করেন নাই। লেখা শেষ হইলে উহা লইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ভারতী সম্পাদিকার হাতে লেখাটি দিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দোতালায় সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় কবি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান।

বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ

১৯০০ সালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সহযোগিতা করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিত বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করেন। বুয়র যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লেখেন।

নৈবেদ্য

এই সময়েই কবি নৈবেদ্যের কবিতাগুলি রচনা করেন এবং উহার মধ্যে একটি কবিতাতে বুয়র যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা প্রকাশিত হয়।

কবি লিখিলেন,—

"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী

... গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবি-চিত্তের ঘৃণা প্রকাশিত হয় নৈবেদ্যের 'ন্যায়দণ্ড' কবিতায়—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হোতে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য জ্বলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একসঙ্গে সব কয়টী কবিতা তিনি পড়িয়া শোনান। কবিতাগুলি শুনিয়া মহর্ষি মুগ্ধ হন এবং বইখানি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহাকে দান করেন।

চোখের বালি

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে হিন্দু সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন ; পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। এই বৎসরেই বঙ্গদর্শনে তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'চোখের বালি' প্রকাশ আরম্ভ হয়।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা

১৯০১ সালে তিনি জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে শান্তি নিকেতনে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর পিতার অনুমতি লইয়া তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ করাই ছিল তাহার অন্তরের অভিপ্রায়। তিনি স্বয়ং ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, তাহাদের সহিত খেলাধূলায় যোগ দিতেন, তাহাদিগকে গল্প বলিতেন, দিবারাত্র সকল সময় ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষকতা কার্য্যে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগ দেন জগদানন্দ রায়, লরেন্স নামক জনৈক ইংরেজ, রেবাচাঁদ নামক জনৈক সিন্ধি খৃষ্টান এবং পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব। ইঁহারাই শান্তিনিকেতনের প্রথম শিক্ষক দল। রীতিমত অর্থকষ্টের ভিতর দিয়া আশ্রম চলিতে লাগিল। জমিদারী হইতে যে ভাতা আসিত পাটের ব্যবসার দেনা শোধ করিতেই তাহার অধিকাংশ শেষ হইয়া যাইত, অবশিষ্ট অর্থ তিনি ব্যয় করিতেন আশ্রমের জন্য। ইহাতে আশ্রমের

ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহের জন্য পুরীর বাড়ী এবং তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরী বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইল। পত্নী মৃণালিনী দেবী তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া তাহা বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। এই বিপদের সময় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আসিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন। আশ্রমের বহু দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করিতে লাগিলেন।

১৯০২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড কার্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে এশিয়াবাসীদের সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এশিয়ার লোকদের স্বভাবই এই যে তাহারা সব কিছু বাড়াইয়া বলিবে এবং সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিবে। লর্ড কার্জ্জনের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে দেশে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়; রবীন্দ্রনাথও উহাতে যোগ দেন।

পত্নী ও কন্যার মৃত্যু

১৯০২ সালের ২৩শে নবেম্বর কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের পত্নী পরলোকগমন করেন। রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৪ বৎসর, রেণুকার ১২, মীরার ১০ এবং সমীন্দ্রনাথের ৮ বৎসর। পত্নীর মৃত্যুর পর পুত্রকন্যাদের লইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান এবং পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে ‘স্মরণ’ শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। কিছু দিন পরে রেণুকা অসুস্থা হইয়া পড়েন, তাঁহাকে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কবি প্রথমে হাজারীবাগ, পরে আলমোড়া গমন করেন। মাতৃহীন শিশু সমীন্দ্রনাথকে ভুলাইবার জন্য এই সময়

তিনি 'শিশু' রচনা করেন। রুগ্না কন্যাকে আলমোড়ায় রাখিয়াই তাঁহাকে জরুরী প্রয়োজনে শান্তিনিকেতনে আসিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে রেণুকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যান আলমোড়ায়। কন্যাকে লইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। জননীর মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে ১৯০৩ সালের মে মাসে রেণুকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক এই সব বিপদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। বঙ্গদর্শনের জন্য 'নৌকাডুবি' উপন্যাস লেখা চলিতে থাকে, তাহা ছাড়া তাঁহার বিখ্যাত রাজনৈতিক রচনা 'রাজকুটুম্ব', 'বুঝোবুঝি', 'ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি এই সময়ে লিখিত হয়।

স্বদেশী সমাজ

১৯০৪ সালে মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহ ৯ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতাবলী একত্র প্রকাশের ইহা দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। ২২শে জুলাই মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভায় কবি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' পাঠ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই সভার সভাপতি। একজন সমাজপতির অধীনে কেমন করিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে, জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কৃষকদের পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা কিরূপে কুটীরশিল্প গঠিত হওয়া সম্ভব, সামাজিক অনুষ্ঠানে বৃথা ব্যয় বাহুল্য কতদূর পর্য্যন্ত কমানো যাইতে পারে, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যায় কিরূপে, হিন্দু মুসলমান মিলনই বা কেমন করিয়া সাধন করা যায়—এই সব

সমস্যা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা তিনি দেশের জনমত উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্বদেশী সমাজ গঠনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রের খসড়া রচনা করিয়া দেন। ইহা গোপনে হাতে হাতে প্রচারিত হয়। প্রতিজ্ঞাপত্রটি এই—

স্বদেশী সমাজ

[পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায়মত এই নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া জোড়াসাঁকোর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। **ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে।** বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এই সঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।]

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্ত্তব্য সাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজনির্দ্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্ব্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালিমাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণতঃ ২১ বৎসরের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক।

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্ব্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্ম্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালিকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্ম্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি তবে তাহাকে বাংলা-রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশী চালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাজনির্দ্দিষ্ট বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

জাতীয় চেতনা দেশবাসীর অন্তরে জাগ্রত করিবার জন্য যে কোন চেষ্টা হইলেই কবি তাহাতে সর্ব্বতোভাবে যোগদান করিতেন। শিবাজী উৎসবেও তিনি আগ্রহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা

টাউন হলের সভায় শিবাজী উৎসব নামক বিখ্যাত কবিতাটি তিনি পাঠ করেন। উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ভবানী পূজার আয়োজন হইলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন এই বলিয়া যে উহাতে অ-হিন্দুদের মনে আঘাত লাগিতে পারে। এই সময় তিনি কয়েকটি স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে ইংরাজী সোপান নামক পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়া দেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। মাত্র ২ হাজার টাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তিনটি উপন্যাস, সমস্ত ছোট গল্প, ছয়টি নাটক, সমস্ত গান এবং কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশের স্বত্ব 'হিতবাদীর' মালিকের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

পিতৃ-বিয়োগ

১৯০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

ভাণ্ডার সম্পাদনা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে আহূত ছাত্র সভায় তিনি পল্লী উন্নয়ন সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। স্বদেশী পণ্যের দোকান খোলা সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল। ১৯০৫ সালের প্রথম ভাগে তিনি এই প্রকার কয়েকটি দোকান খোলার জন্য উৎসাহ দেন। 'ভাণ্ডার' নামক একটি নূতন মাসিক পত্রের সম্পাদনার ভার তিনি এই সময়ে গ্রহণ করেন। দেশের নানাবিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা ছিল ভাণ্ডারের বিশেষত্ব। জনসাধারণের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের যোগ স্থাপনের প্রশ্ন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

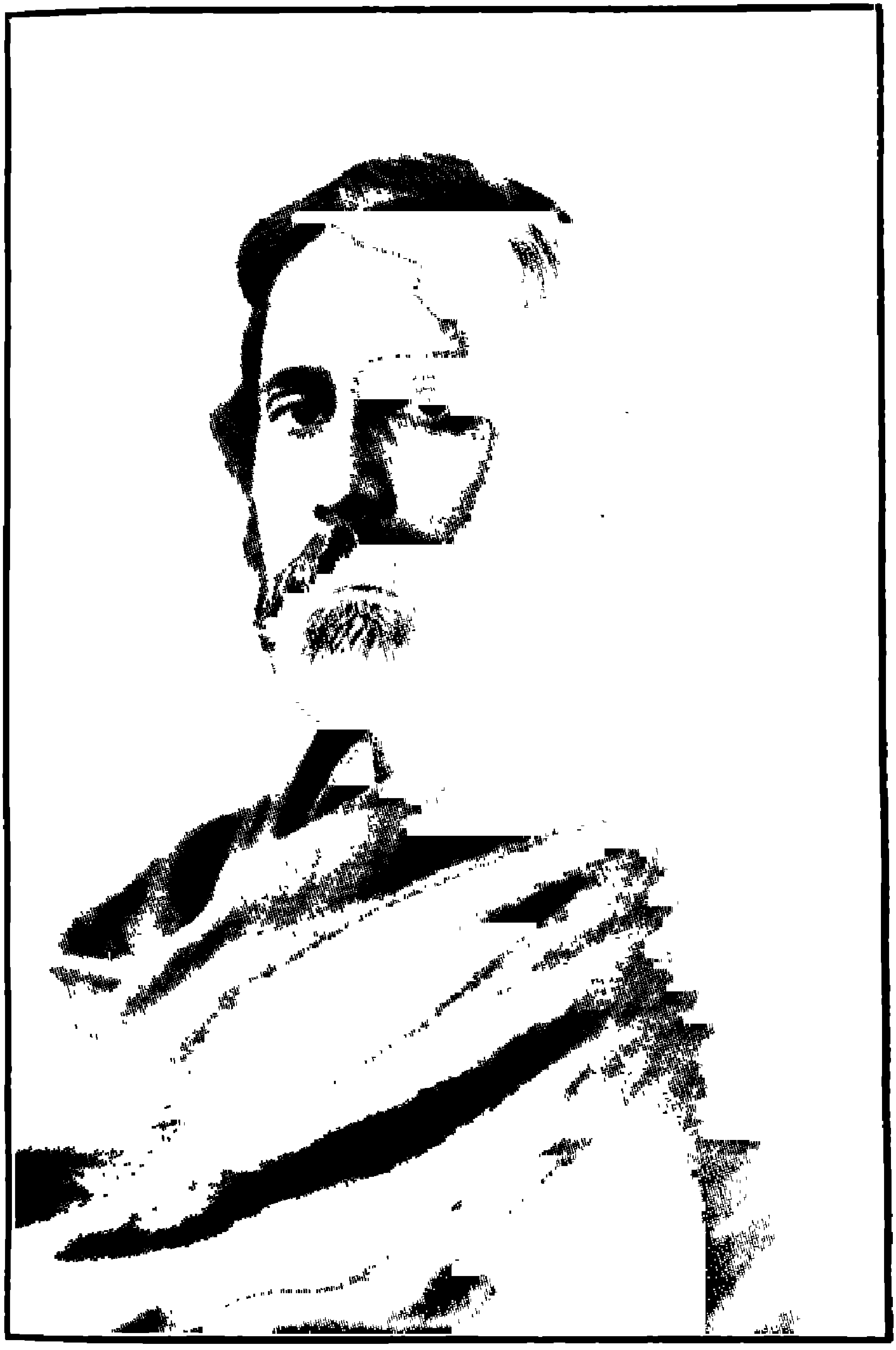

ভাণ্ডারে আলোচনার সূত্রপাত করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি এই আলোচনায় যোগদান করেন।

স্বদেশী শিল্প প্রসারের চেষ্টা

ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীর আহ্বানে কবি আগরতলায় গমন করেন এবং সেখানে 'দেশীয় রাজা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহ দান এবং বিলাস সামগ্রী আমদানী বন্ধ করিবার জন্য তিনি দেশীয় নৃপতিগণকে অনুরোধ করেন। ই, বি, হাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় আর্টের বঙ্গীয় স্কুলকে তিনি প্রভূত সাহায্য করেন। এই কার্যে তাঁহার সহযোগিতা করেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বদেশী শিল্পের প্রসার কল্পে কলিকাতায়, নিজের জমিদারীতে এবং অন্যত্র তিনি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভাণ্ডারে 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সাম্রাজ্য-বাদীদের অর্থনৈতিক শোষণের রূপ প্রকাশ করিয়া দেন।

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে লর্ড কার্জ্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর বাঙ্গলায় তুমুল স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে সমগ্র দেশ বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ২৫শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা আহূত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এক সপ্তাহ পরে প্রবন্ধটি এলবার্ট থিয়েটারের সভায় পুনরায় পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় গ্রাম্য শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রতি বিশেষ ভাবে ঝোঁক দেন। একটির পর একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া কবি বাঙ্গলার গণচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। দিনের পর দিন বহু জনসভায় সহস্র সহস্র শ্রোতা তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকে। এই সময় কবিকে সাহায্য করেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ।

রাখী বন্ধন

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, বাঙ্গলা ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন, যেদিন বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করা হইল, সেই দিন রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলায় রাখীবন্ধনের সূচনা করিলেন। (কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সহস্র সহস্র লোক শোভাযাত্রা করিয়া প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইল, তারপর বাঙ্গালীর ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ একে অপরের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিল।) বাঙ্গালীর কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিয়া উঠিল তাঁহারই রচিত গান—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান—
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
হে ভগবান—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক
হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান।”

বাঙ্গালীর সেই শোকের দিনে কোন গৃহে কেহ রন্ধন করিল না, কলিকাতার সমস্ত দোকানপাট সেদিন বন্ধ রহিল। ঐ দিন অপরাহ্ণে অপার সার্কুলার রোডে এক বিরাট জনসমষ্টির সম্মুখে আনন্দ-মোহন বসু ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, রবীন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। সভার পরে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাটীর উত্থান প্রাঙ্গনে শোভাযাত্রা শেষ হইল। সেখানেই রবীন্দ্রনাথ একটী জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সভাতেই ৫০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইল।

কার্লাইল সার্কুলার

ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে দেখিয়া বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ এক সার্কুলার জারী করিয়া জানাইয়া দেন যে, কোন ছাত্র স্বদেশী সভায় যোগদান করিলে অথবা বন্দেমাতরম্

গান করিলে তাহাকে শিক্ষায়তন হইতে বিতাড়িত করা হইবে। এই আদেশই কার্লাইল সার্কুলার নামে কুখ্যাত। ইহার প্রতিবাদে বাঙ্গলায় বহু সভা সমিতির অনুষ্ঠান হয় এবং রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত ভাবে শ্রম স্বীকার করিয়া কলিকাতার সভাসমূহে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক সভায় সহস্র সহস্র শ্রোতা তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। বিডন স্কোয়ারের ছাত্র সভায় এবং পশুপতি বসুর প্রাঙ্গনে বিজয়া সম্মিলনীতে তাঁহার বক্তৃতা ছাত্র সমাজে বিশেষ আলোড়ন তুলিয়াছিল।

স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে রবীন্দ্রনাথের দান সামান্য নহে। সরকারী স্কুল হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের অভিযোগে বিতাড়িত ছাত্রেরা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত স্কুল ও কলেজে স্বদেশী ধারায় শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবরাজরূপে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষে আগমন করেন। গোখেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত করে। ভাণ্ডারে 'রাজভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের সমালোচনা করেন।

কবি লেখেন, "যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

"ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই

কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল—আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

"দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মত আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্দ্ধে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্ব্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা, উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন শোষণের আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র—ইহারা যদি বা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেখানেই নত হওয়ায় গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেই জন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হও নাই।"

নব গঠিত প্রদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গবর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের আমলে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশ যে অত্যাচার আরম্ভ করে, ভাণ্ডারে তিনি তাহার প্রতিবাদ

করেন এবং নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত [illegible]গণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

নরমপন্থী ও চরমপন্থী দল

১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিনি আমেরিকা ও জাপানে প্রেরণ করেন। বরিশালে রাজনৈতিক সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন আহূত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত সম্মেলনের সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হন। স্বদেশী আন্দোলন দমন তখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বরিশালে উভয় সম্মেলনের একটিও অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ভার ত্যাগ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার রাজনৈতিক নেতারা নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। রবীন্দ্রনাথ 'দেশ-নায়ক' প্রবন্ধে এই দলাদলির নিন্দা করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেতারূপে গ্রহণ করিবার জন্য বাঙ্গালী জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

শিক্ষা সমস্যা

জাতীয় শিক্ষা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে দেশের কল্যাণ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া এক পরিকল্পনা রচনার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপর। এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করে তাঁহার 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ১৯০৬ সালের জুন মাসে ওভারটুন হলে এক

জনসভায় পঠিত হয়। এই বিষয়ে তিনি আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। জুলাই মাসে 'খেয়া'র কবিতাগুলি রচিত হয়। ১৪ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসবে তিনি যোগদান করেন এবং পরিষদের উদ্যোগে সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। ডিসেম্বর মাসে ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ

১৯০৭ সালে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। জাতীয় আন্দোলনে ক্রমবর্দ্ধমান দলাদলি তাঁহার অন্তরকে পীড়া দিতে আরম্ভ করে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমেই ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়াও কবি ব্যথিত হন। রাজনীতিক্ষেত্রের আবহাওয়া তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন শান্তিনিকেতনের নিভৃত কোণে। কবির এই অন্তরের দ্বন্দ্ব ভাষা পাইল প্রবাসীতে প্রকাশিত 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধে। প্রবাসী তখন এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত। আত্মশুদ্ধি ভিন্ন প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর নহে, তাঁহার এই ধারণা তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সহসা সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনাও বিস্তর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। এই সময় হইতে সাহিত্য সেবায় তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কবির নব নব কবিতা প্রবন্ধ ও গল্পে বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে লাগিল।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে

অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হইলে 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইল।

কুটীরশিল্প ও কৃষির প্রতি অনুরাগ

১৯০৭ সালে কবি কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ দিলেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত। বাঙ্গলার মাটির প্রতি তাঁহার নিবিড় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পুত্রকে আমেরিকা পাঠাইয়াছিলেন কৃষি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে, জামাতাকেও আমেরিকা পাঠাইলেন কৃষি বিদ্যা শিখিতে। দেশে কুটীরশিল্প বিস্তার ও কৃষি বিদ্যার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, তাই স্বয়ং জমিদারীতে বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পুত্র ও জামাতাকে কৃষি বিদ্যা শিখাইবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ ছিল।

১৯০৭ সালের নবেম্বর মাসে মুঙ্গেরে অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।

প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' প্রকাশিত হয়।

পাবনা সম্মেলন

১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে অনেক চেষ্টার পর তাঁহাকে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত করানো হয়। মাত্র একমাস পূর্ব্বে সুরাট কংগ্রেসে দক্ষ যজ্ঞের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে পাবনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি বাঙ্গলায় সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। এই

অভিভাষণেও তিনি গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং গ্রামের উন্নতি ও হিন্দু মুসলমান মৈত্রী স্থাপন করিতে দেশবাসীকে আহ্বান করেন।

দমন নীতির নিন্দা

১৯০৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ মজঃফরপুরে প্রথম বোমা বিস্ফোরণ এবং ২রা মে মাণিকতলার বাগান বাড়ীতে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ২৫শে মে চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সরকারী দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন, হতাশাব্যঞ্জক এই প্রকার কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশবাসীকেও সাবধান করেন এবং ধৃত যুবকদের সাহসিকতা ও ত্যাগ স্বীকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করেন।

'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে কবি লেখেন, "তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাত বিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনো মতেই কৃতকার্য্য হইবেন না একথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

"যে ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎ শক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপ বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত আঘাত অপমান সমস্ত

বেদনা যাহাকে এই পরম প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ অধৈর্য্য অহঙ্কারকে এই মহা সাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারত বিধাতার পদতলে নিজের নির্ম্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতির উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন একথা আপনারা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবেন তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্ম্মনির্দ্দেশশূন্য স্পর্দ্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না—নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি হৃদয় এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।"

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাড়াইবার জন্য তৃতীয় পক্ষের অবিরাম চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া তিনি হিন্দু মুসলমান বিরোধের মূল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া প্রবাসীতে 'সদুপায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমন্বয় সম্বন্ধে এই সময় তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এক ছাত্র সভায় একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

প্রথম জীবনস্মৃতি

১৯০৮ সালে 'শারদোৎসব' নাটকটি রচিত হয়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রেরা উহা অভিনয় করেন। শান্তিনিকেতন

মন্দিরে উপাসনায় তিনি অনেকগুলি মূল্যবান উপদেশ দেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে তাঁহার প্রথম আত্মচরিত প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া নীরব থাকিতে চান। অবশেষে বঙ্গদর্শনের তৎকালীন সম্পাদক শৈলেন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনার প্রত্যুত্তর দেন। এই সময় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তিনি সত্যাগ্রহের মূলতত্ত্ব ফুটাইয়া তোলেন। শান্তিনিকেতনে নাটকটি অভিনীত হয় এবং তিনি স্বয়ং মূল চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

গীতাঞ্জলি

১৯০৯ সালে শিলাইদহে কবি গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিন বৎসর আমেরিকা বাসের পর পুত্র রথীন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কবি নবেম্বর মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। অতঃপর রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি নৌকায় উত্তর বঙ্গের জমিদারী পরিদর্শনে বাহির হন। কলিকাতায় ফিরিয়া ওভারটুন হলে এক জনসভায় 'তপোবন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজে এক অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করেন, এই উপদেশ 'বিশ্ববোধ' নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে একটি বিধবা বালিকার সহিত পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন। ডিসেম্বর মাসে তাঁহার রূপক নাট্য 'রাজা' প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরে এক সাহিত্য সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হন

ও বক্তৃতা করেন। ১৯১১ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রে তাঁহার ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ হয়। অনুবাদ করেন লোকেন পালিত।

অচলায়তন

১৯১১ সালের ৭ই মে শান্তিনিকেতনে তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে 'রাজা' অভিনীত হয় এবং কবি স্বয়ং উহার প্রধান চরিত্র ঠাকুরদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অজিত চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবির কাব্য বিচারের ইহাই প্রথম প্রয়াস। প্রবাসীতে তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশ আরম্ভ হয় এই সময়ে। প্রগতির পথে গোঁড়ামির বিপুল বাধা কবি মূর্ত্ত করিয়া তোলেন তাঁহার 'অচলায়তন' নাটকে। প্রবাসীতে নাটকটি প্রকাশিত হইবার পর গোঁড়া সমাজপতিদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন ওঠে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে 'ধর্ম্মের অর্থ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি অচলায়তনের সমালোচকদের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন।

জনগণমন অধিনায়ক জয়হে—

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি স্থায়ী কেন্দ্র বাঙ্গলায় স্থাপন করিবার জন্য কবির গভীর আগ্রহ ছিল। চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে রিপন কলেজ হলে এক সভায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব হয় তিনি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন এই সভার

সভাপতি। আনন্দ কুমার স্বামী এই সময় শান্তিনিকেতনে আগমন করেন এবং অজিত চক্রবর্ত্তীর সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদগুলি মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হয়।

'ডাকঘর' নাটকটী এই সময়কার রচনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রবাসী এবং ভারতীতে ১৯১১ সালে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কবি তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে গান করিবার জন্য আশুতোষ চৌধুরীর অনুরোধে কবি তাঁহার বিখ্যাত সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয়হে'—রচনা করেন।

১৯১২ সালের ২৮শে জানুয়ারী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনাসভার আয়োজন হয়। ভারতবর্ষের কোন সাহিত্য-সেবী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এত বড় অভিনন্দন পান নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে কবির অতুলনীয় অবদানের কথা বর্ণনা করিয়া পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সভায় এক অপূর্ব্ব অভিভাষণ পাঠ করেন। বাঙ্গলা ভাষায় গবেষণা চালাইবার জন্য এই উপলক্ষ্যে সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথের নামে একটি ফণ্ড স্থাপন করেন।

রাজরোষে শান্তিনিকেতন

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব বাঙ্গলা সরকার সুনজরে দেখেন নাই। তাঁহার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা-দেশের ছেলেরা অধ্যয়ন করে ইহা সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। ১৯১২ সালে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্টের এক গোপন সার্কুলার

প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই সার্কুলারে সরকারী কর্ম্মচারীগণকে জানানো হয় যে শান্তিনিকেতন তাঁহাদের সন্তানগণের শিক্ষা লাভের উপযুক্ত স্থান নহে। এই সার্কুলার জারীর পর সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের পুত্রগণকে শান্তিনিকেতন হইতে সরাইয়া লইতে আরম্ভ করেন। সরকারী সার্কুলারে কবি ক্ষুব্ধ হন, বহু ছাত্র চলিয়া যাওয়ায় আশ্রমের ক্ষতিও হয়, কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে ইউরোপে গমন করিয়া বিশ্ববাসীকে তিনি শান্তি-নিকেতনের আদর্শের কথা শুনাইবেন। এই সময় মাইরণ ফেল্‌প্‌স নামক জনৈক আমেরিকান আইনজীবী শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষা প্রণালীর উন্নত আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

লণ্ডনের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয়

১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার পর অকস্মাৎ কবি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মালপত্র মাদ্রাজ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল। বিশ্রাম লইবার জন্য তিনি শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। ২৭শে মে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

১৯১২ সালের ১৬ই জুন কবি লণ্ডনে পদার্পণ করিলেন। এই সময় বিখ্যাত বৃটিশ চিত্রকর উইলিয়াম রথেনষ্টাইনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রথেনষ্টাইন কবির কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন। ইয়েটস, ষ্টপফোর্ড ব্রুক, ব্রাডলি প্রভৃতিকে

রথেনষ্টাইন কবিতাগুলি দেখান এবং ইঁহারাও কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অতঃপর রথেনষ্টাইন তাঁহার গৃহে লণ্ডনের বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গণকে আমন্ত্রণ করেন এবং কবির কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁহাদিগকে শোনান হয়। ইঁহাদের মধ্যে ঐ দিন মে সিনক্লেয়ার, ইভেলিন আণ্ডারহিল, আর্ণেষ্ট রিজ, ফক্স ষ্ট্র্যাংওয়েজ, চার্লস ট্রেভে-লিয়ান, এজরা পাউণ্ড, এলিস মেনেল, হেনরি নেভিনসন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, এবং কবিতাগুলি পাঠ করেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। এইখানেই চার্লস এণ্ড্রুজের সহিত কবির প্রথম পরিচয় হয়।

বিলাতের গ্রাম পরিদর্শন

কবির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিলাতের বিখ্যাত সাপ্তাহিকপত্র 'নেশন' ১৯শে জুলাই ট্রোকাডেরো হোটেলে ইংলণ্ডের মনীষীবৃন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য এক পার্টির আয়োজন করেন। গ্রামের প্রতি টান কবি বিলাতে গিয়াও ভোলেন নাই। ইংলণ্ডের গ্রামের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি ষ্টাফোর্ডশায়ারের বাটারটনে গমন করিলেন। এখানে তিনি জেনারেল উটরামের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বাটারটনে কিছুদিন থাকিয়া তিনি গেলেন গ্লোসেষ্টারশায়ারের চার্লফোর্ডে। লণ্ডনে ফিরিবার পর বার্ণার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, জন মেসফিল্ড, লোয়েস ডিকিনসন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণের সহিত কবি সাক্ষাৎ করেন। 'রাজা' এবং 'ডাকঘর' এই সময় ইংরেজীতে অনূদিত

ইংরেজি গীতাঞ্জলি

লণ্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়া ২৭শে অক্টোবর কবি নিউইয়র্ক সহরে পৌছান। তথা হইতে যান ইলিনোয়ার উর্ব্বানা সহরে। আমেরিকার কয়েকটি ইউনিটেরিয়ান গির্জ্জায় তিনি বক্তৃতা করেন। ১লা নবেম্বর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলির ১০৩টি শ্রেষ্ঠ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ 'গীতাঞ্জলি' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। মাত্র ৭৫০ খানা বই ছাপা হয়। কবি ইয়েটস বইখানির ভূমিকা লেখেন এবং রথেনষ্টাইন উহার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি রেখা-চিত্র আঁকিয়া দেন। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইলে বিলাতের সাহিত্যিক মহলে সাড়া পড়িয়া যায় এবং সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বইখানিকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি বলিয়া প্রশংসা করেন।

রচেষ্টার জাতিতত্ত্ব কংগ্রেস

১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে কবি উর্ব্বানা হইতে শিকাগো গমন করেন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রচেষ্টারে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণ জাতিতত্ত্ব আলোচনার জন্য এক কংগ্রেসে সমবেত হইয়াছিলেন। কবি সেখানে গমন করেন। বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক রুডলফ অয়কেনের সহিত সেখানে তাঁহার পরিচয় হয়। গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া অয়কেন ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কংগ্রেসে কবি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রচেষ্টার হইতে তিনি বোষ্টনে যান এবং সেখানে এক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও কবি একটি বক্তৃতা করেন। এই সময় গীতাঞ্জলির

মৈত্রী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫৩ সাল
ঘোষপাড়া, বালী।

সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই 'গার্ডেনার' এবং 'ক্রিসেণ্ট মুন' প্রকাশিত হয়। ইণ্ডিয়া সোসাইটি 'চিত্রা' নাম দিয়া 'চিত্রাঙ্গদার' ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে তাঁহার কবিতার অনুবাদ শোনান। ১৯১৩ সালের ২৬শে মে সিমলায় বড়লাট ভবনে এক বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সম্মুখে এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বর্ণনা করেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

জুন মাসে কবি আমেরিকা হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন। লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে ধারাবাহিক ভাবে ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দেশে ফিরিবার জন্য কবি জাহাজে উঠিলেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সংবাদ পান যে বাঙ্গলাদেশে এক ভীষণ বন্যায় দরিদ্র জনসাধারণের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে। বিলাতী সংবাদপত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত না হওয়ায় তিনি বিলাতী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। ৪ঠা অক্টোবর বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়া ৬ই তারিখে কবি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

নোবেল পুরস্কার লাভ

১৯১৩ সালের ১৩ই নবেম্বর ভারতবাসী অবগত হইল যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গীতাঞ্জলির জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। সুইডিশ একাডেমি গীতাঞ্জলিকে বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। এই সংবাদে দেশের সর্ব্বত্র আনন্দের ঢেউ বহিয়া যায়। শুধু ভারতবাসী নহে, এশিয়াবাসীর পক্ষে নোবেল পুরস্কার লাভ এই প্রথম। কলিকাতার বহু লোক কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য স্পেশাল ট্রেণে শান্তিনিকেতন গমন করিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে কবি অনুযোগ দেন যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এই সম্মান লাভের পূর্ব্বে তাঁহার দেশ-বাসী তো তাঁহার প্রতি এতখানি অনুরাগ দেখান নাই। কবির এই তীক্ষ্ণ অনুযোগের কটু সমালোচনা আরম্ভ হয়, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল কবিকে সমর্থন করেন। 'হিন্দু রিভিউ' পত্রে বিপিনচন্দ্র লেখেন "কবিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে ডেপুটেশন শান্তিনিকেতনে গিয়াছিল তাহার অসারতা কবি সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি জানিতেন যে ইঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন এবং তাঁহার বাণী উপলব্ধি করিয়াছেন। (তিনি স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আজ আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন?) যাঁহাদিগকে এতদিন আমি তুষ্ট করিতে পারি নাই, আজ আমি অকস্মাৎ এমন কোন শক্তির অধিকারী হইয়াছি যে তাঁহারা আমার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন? আজ হঠাৎ আপনারা আমাকে এই সম্মান দেখাইতে আসিয়াছেন আমার নিজস্ব শক্তির প্রতি শ্রদ্ধার বশে নয়, বিদেশীরা আমার শক্তি স্বীকার করিয়াছে দেখিয়া আপনারা আজ

ছুটিয়া আসিয়াছেন। আপনাদের মহানুভতার জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু গিল্টি করা পেয়ালায় যে বিদেশী মদ্য আপনারা আমার মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহেন তাহা পান করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমাকে ক্ষমা করিবেন।') জাতীয় প্রচেষ্টা ও কীর্তির নৈতিক মূল্য বিদেশীর দ্বারা স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা উহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দান করিতে চাহেন না তাঁহাদিগকে এই স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলে তাহা রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত কার্য্য হইত না।"

ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরূপে রামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে আসিলে তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন এবং দেশে ফিরিয়া ডেলি ক্রনিকেলে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯১৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য ডি-লিট উপাধি প্রদান করেন।

কলিকাতার লাট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় লর্ড কারমাইকেল কবিকে নোবেল পুরস্কার এবং পদক প্রদান করেন।

সবুজ পত্র

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে স্কুলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়। শন্তিনিকেতনে অচলায়তন অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং উহার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং পিয়ার্সনও উহাতে অভিনয় করেন। পিয়ার্সন চমৎকার বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন।

প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগে এই বৎসর 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হয়।

কবি প্রতি মাসে সবুজ পত্রে কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর গ্রীষ্মকাল তিনি কাটান আলমোড়ার রামগড় পাহাড়ে।

আরব কবির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিবার পর সেখানে তাঁহার সহিত একজন আরব কবি আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। এই আরব কবির নাম বুস্তানি, ইনি ইংরেজি হইতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবির খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় তাঁহার কবিতা ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষাগুলিতে অনূদিত হয়। ভারতীয় নারীদের অসহায় করুণ জীবনের ছবি আঁকেন তিনি সবুজপত্রে, 'স্ত্রীর পত্র' শীর্ষক গল্পে। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল 'মৃণালের পত্র' লিখিয়া উহাতে কবির উক্তিকে ব্যঙ্গ করেন। কবি তাহার উত্তর দেন সবুজপত্রে, 'বাস্তব' ও 'লোকহিত' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে।

মা মা হিংসী

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পরদিন কবি শান্তি-নিকেতনে উপাসনায় এক অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন এবং তাহার পর 'মা মা হিংসী' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর পঞ্চাশৎ বার্ষিক জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়, কবি উহাতে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। উৎসব অন্তে কবি শান্তিনিকেতনে

ফিরিয়া যান এবং কিছু দিন স্বরুলে অবস্থান করেন। এখানে ৪৬ দিনে ১০৮টি গান রচনা করেন এবং দীনেন্দ্রনাথকে সবগুলি শিখাইয়া দেন। কবি গান রচনা করিলেই তাহাতে স্বর সংযোগ করিয়া দীনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিতেন। এই গানগুলি 'গীতালি' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সবুজপত্রের জন্যও কবি অনেকগুলি কবিতা লেখেন, এগুলি 'বলাকা' নামে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া 'ভাই ফোঁটা' এবং 'শেষের রাত্রি' গল্প দুটি এই সময়ের রচনা। শেষোক্ত গল্পটি কবি স্বয়ং ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং 'মাসী' নামে উহা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই বৎসর পূজার ছুটিতে কবি বুদ্ধ গয়া এবং এলাহাবাদে ভ্রমণ করেন এবং কিছু-দিনের জন্য দার্জিলিং-এও গমন করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া তিনি আবার এলাহাবাদ ও আগ্রায় যান। এলাহাবাদে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'তাজমহল' রচিত হয়।

গান্ধীজীর সহিত পরিচয়

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে গান্ধীজী ফিনিক্স স্কুল নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন, এণ্ডরুজ এবং পিয়ার্সন তখন শান্তি-নিকেতনে। ইহারা গান্ধীজীর সহিত সত্যাগ্রহে যোগদান করিবার জন্য আফ্রিকায় গমন করেন। এণ্ডরুজের মারফৎ কবি গান্ধীজীর ফিনিক্স স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ফিনিক্স স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে আগমন

করেন। পূর্ব্ববঙ্গের পাটচাষীরা ঐ বৎসর অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা চিনি ও রুটি খাওয়া বন্ধ করিয়া টাকা জমাইয়া উহা পাটচাষীদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিতে লাগিল। কবি ইহা জানিতে পারিয়া আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন, "ত্যাগ স্বীকারের প্রকৃষ্ট উপায় কঠোর পরিশ্রম করা এবং ঐ শ্রমের দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ দুর্গতদের সাহায্যে প্রেরণ করা।" ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন উপলক্ষে ১৩ই ফেব্রুয়ারী কবি এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান। গান্ধীজী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে বিলাত ঘুরিয়া বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রগণকে দেখিবার জন্য শান্তিনিকেতনেও আসিয়াছিলেন, কিন্তু কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পূর্ব্বেই গোখেলের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পুণা চলিয়া যান। স্থরুলে কয়েকদিন থাকিয়া কবি 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন এবং ৪ঠা মার্চ্চ শান্তিনিকেতনে উহা পড়িয়া শোনান। ফাল্গুনী সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়। ৬ই মার্চ্চ গান্ধীজী পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কবি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে ছাত্রগণকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের নিজেদের দ্বারা রাঁধুনী, ভৃত্য ও ঝাড়ুদারের কাজ করানো আরম্ভ হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা বন্ধ হয়। কবি নিজেও ইহার সারবত্তায় বিশ্বাস করেন নাই। কোন লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে দিয়া কোন কাজ করাইবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ১০ই মার্চ্চ দিনটি এখনও শান্তি-

নিকেতনে 'গান্ধী দিবস' বলিয়া প্রতিপালিত হয়। ঐ দিন শিক্ষক ও ছাত্রেরা আশ্রমের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ভৃত্য ও ঝাড়ুদারেরা সে দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়।

ঘরে বাইরে

১৯১৫ সালের ২০শে মার্চ্চ বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল কবির আতিথ্য গ্রহণ করেন। ৩১শে মার্চ্চ গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। গান্ধীজীর সহিত ফিনিক্স স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ হরিদ্বার চলিয়া যান। কবি কিছুদিন সুরুলে অবস্থান করেন। সেখানে 'চতুরঙ্গের' চারিটি গল্প লিখিত হয় এবং ঐগুলি সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়। অনেকগুলি গান ও কবিতাও রচিত হয়। অতঃপর কবি সবুজ পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের জন্য 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লিখিতে আরম্ভ করেন।

এই বৎসর ৩রা জুন রাজার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবিকে 'সার' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কবি অতঃপর কাশ্মীর গমন করেন এবং সেখানে বসিয়া বহু কবিতা ও গান রচনা করেন। বিলাতের শেক্সপীয়ার সোসাইটির অনুরোধে শেক্সপীয়র ত্রি-শতাব্দী স্মৃতি গ্রন্থের জন্য একটি বাঙ্গলা সনেট লিখিয়া পাঠান।

শিক্ষার বাহন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হউক ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। কাশ্মীর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া রামমোহন লাইব্রেরীতে এক জনসভায় কবি 'শিক্ষার বাহন'

শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন।

কবি লিখিলেন, "বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্ব্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজ করিয়া সহরের ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আম্‌দানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা বৃথা। যদি বিলিতি জাহাজ-টাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা সহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।

"এখন কথাটা এই, যে-সব বাঙালীর ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যে জন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে এক দিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়ে কড়া আইন। এ-যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেন না মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্য্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণ শক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাশ করে তারা অসভ্য রকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

"আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্য্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তারপর

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? একে তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষার উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।"

বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান

বাঁকুড়ায় ১৯১৫ সালের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেখানকার দুর্গত জনগণের সাহায্যকল্পে কবি ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে জোড়াসাঁকোয় ফাল্গুনী অভিনয়ের আয়োজন করেন এবং স্বয়ং উহাতে কবিশেখর এবং অন্ধ বাউল এই দুইটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয়ের পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি ঘরে বাইরে রচনা সমাপ্ত করেন। 'বলাকা' এই বৎসর প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটিন সাহেব প্রহৃত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট ছাত্র দলন আরম্ভ করেন, কবি সবুজপত্রে ছাত্র শাসন শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা

৩রা মে এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন এবং মুকুল দেকে সঙ্গে লইয়া কবি জাপান যাত্রা করেন। ৬ই মে রেঙ্গুন পৌছিবার পর তথাকার অধিবাসীগণ

কবিকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জাহাজ ১০ই মে রেঙ্গুন ছাড়িয়া ১৫ই তারিখে সিঙ্গাপুর এবং ২২শে মে হংকং পৌঁছে। হংকং-এ জাহাজের কাপ্তেন আসিয়া কবিকে জানান যে সাংহাই যাওয়া আর সম্ভব হইবে না, কারণ জাপানের অধিবাসীবৃন্দ কবিকে দর্শন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। হংকং হইতে সোজা জাপান অভিমুখে জাহাজ চালাইতে হইবে। ২৯শে মে জাহাজ কোবে পৌঁছিল। জাপানী মনীষীবৃন্দের এক সভায় কবিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল, কাউণ্ট ওকুমা জাপানী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন এবং কবি তাহার উত্তর দিলেন বাঙ্গলায়। কিছুদিন কবি বিখ্যাত জাপানী চিত্রকর হারার অতিথিরূপে অবস্থান করিলেন। জাপানে বসিয়াই কবি নবপ্রতিষ্ঠিত চীনা গণতন্ত্রের উপর জাপানের সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টির নিন্দা করেন। ১৭ই জুন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানের প্রতি ভারতের বাণী সম্বন্ধে কবি এক বক্তৃতা করেন। জুলাই মাসে কিও গিজুকু বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানের মর্ম্মবাণী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। এই সব বক্তৃতায় কবির স্পষ্ট কথা শুনিয়া জাপানী গবর্ণমেণ্ট মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

এই সময়ে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার সহরে পদার্পণের জন্য কবির নিকট আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু কানাডায় ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইত বলিয়া কবি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

আমেরিকায় বক্তৃতা

১৮ই সেপ্টেম্বর কবি আমেরিকায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন। সিয়েট্ল্ সানসেট ক্লাবের মহিলা সদস্যগণ কবিকে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কবি আমেরিকায় পৌঁছিবার পর জে বি পণ্ড নামক জনৈক আমেরিকান তাঁহার সহিত চুক্তি করেন যে কবি যাহাতে আমেরিকার সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিতে পারেন পণ্ড তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। এই চুক্তি অনুসারে সানসেট ক্লাবে ২৬শে সেপ্টেম্বর কবি প্রথম বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদী নীতি। এই বক্তৃতায় কবি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের তীব্র নিন্দা করেন। ২৭শে তারিখে পোর্ট-ল্যাণ্ডে এবং ৩০শে তারিখে সানফ্রান্সিস্কোতে কবি বক্তৃতা করেন। এই দুই বক্তৃতায় কবি মানব সমাজে ভ্রাতৃভাব ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কবির মতামতের তীব্র সমালোচনা আমেরিকার কয়েকটি সংবাদপত্র করিতে আরম্ভ করে। কবি ইহাতে বিচলিত হইলেন না।

৪ঠা অক্টোবর লস এঞ্জেলসের জনসাধারণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে।

নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া থিয়েটারে এক জনসভায় কবি তাঁহার একটি ছোট গল্প এবং রাজার ইংরেজী অনুবাদ হইতে কয়েকটি অংশ পাঠ করেন।

কবির প্রতি গদর দলের ক্রোধ

হিন্দুস্থান গদর দলের বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে রামচন্দ্র নামক জনৈক শিখ তখন আমেরিকায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সার উপাধি পরিত্যাগ করেন নাই অথচ তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতেছেন এই কারণে রামচন্দ্র কবির তীব্র সমালোচনা করিয়া সংবাদপত্রে এক

প্রবন্ধ লিখিলেন। এই সময় এক গুজব রটে যে গদর দল তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে রামচন্দ্র জানাইয়াছিলেন যে কবিকে হত্যা করিবার ইচ্ছা গদর দলের ছিল না। এই ঘটনা দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা কবিকে দেশে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন কিন্তু কবি তাহাও শুনিলেন না। সেণ্ট বারবারা সহরে পুনরায় তিনি জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর পাসাডেনা, সল্ট লেক সিটি, শিকাগো, আইওয়া, মিলওয়াকি, লুইভেল ও ডেট্রয়েট সহরেও কবি জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ক্লিভল্যাণ্ডের বিখ্যাত টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাবে আমেরিকানদের অর্থ-গৃধ্নুতার সমালোচনা করিয়া কবি বক্তৃতা করেন।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের সমালোচনা

১৮ই নবেম্বর কবি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলে সংবাদপত্র প্রতি-নিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবি ইঁহাদের সমক্ষে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ এবং এশিয়াবাসীদের প্রতি আমেরিকার বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। ২১শে নবেম্বর নিউইয়র্কের কার্ণেগী হলে কবি বক্তৃতা করেন। অতঃপর ফিলাডেলফিয়ায় এবং পুনরায় নিউইয়র্কের পলিটিক্যাল এডুকেশন স্কুলে কবি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় বিষয় ছিল 'ব্যক্তিত্ব'। বোষ্টনের মাউণ্ট হলিওক কলেজে কবি 'শিল্পকলা' সম্বন্ধে এবং ট্যারামাউণ্ট টেম্পলে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বোষ্টনের জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা

করে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতি হ্যাডলি কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে কবির জীবনের উদ্দেশ্য আলোক ও সত্যের সন্ধান।

আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে ১২ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কে আসিয়া কবি সেখানে এক বিরাট জনসভায় তাঁহার শেষ বক্তৃতা করেন। নিউইয়র্ক হইতে তিনি ক্লিভল্যাণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে শেক্স-পীয়র উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। তারপর কলোরাডোর বিখ্যাত ঝরণা দেখিয়া কবি সানফ্রান্সিস্কোতে আগমন করেন এবং তথা হইতে ১৯১৭ সালের ২১শে জানুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করেন।

বিচিত্রা ক্লাব

পথিমধ্যে একদিনের জন্য তিনি হনোলুলুতে অবতরণ করেন। ১৭ই মার্চ্চ কবি কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন।

কবির আমেরিকা অবস্থান কালে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং রথীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ভবনে বিচিত্রা শিল্প বিদ্যালয় এবং বিচিত্রা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দুইটি দেখিয়া কবি অত্যন্ত প্রীত হন। বিচিত্রা ক্লাব অল্প দিনের মধ্যেই সহরের সাহিত্যসেবীদের মিলন ক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

প্রমথ চৌধুরী সবুজ পত্রের সাহায্যে বাঙ্গলায় কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষারূপেও জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কবি সবুজ পত্রে 'ভাষার কথা' প্রবন্ধটি লিখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন।

'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'

আনি বেশান্ত রাজনৈতিক কার্য্য কলাপের জন্য অন্তরীণ হইলে কবি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। প্রথমে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরীতে পরে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে কবি 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের অনুরোধে কবি 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি রচনা করেন এবং আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চের সভায় উহা গীত হয়। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

দমন নীতির প্রতিবাদ

ভারত রক্ষা আইনে এই সময় বাঙ্গলাদেশে যে গ্রেপ্তার ও বিনা-বিচারে আটক নীতি ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হইতেছিল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে জনৈক বন্ধুকে কবি এক পত্র লেখেন। ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহে ৭ই সেপ্টেম্বর পত্রখানি প্রকাশিত হয়। কবির এই পত্রে দেশে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইল গবর্ণমেণ্ট তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বাঙ্গলার লাট লর্ড রোণাল্ডশে কবির অভিযোগসমূহ অস্বীকার করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতা করিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেস

অন্তরীণাবদ্ধ আনি বেশান্তকে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে সভানেত্রী নির্ব্বাচন করিবার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার প্রতিবাদ করেন। কবি আনি বেশান্তের

নির্ব্বাচন সমর্থন করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মৌলবী ফজলুল হক একত্র আসিয়া কবিকে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়াও গোলযোগ চলিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের স্থলে কবিকে নির্ব্বাচিত করা হইল। মডারেট দল আনি বেশান্তকে সভানেত্রীরূপে মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলে কবি বৈকুণ্ঠনাথের আনুকূল্যে পদত্যাগ করিলেন।

বিচিত্রা ক্লাব ভবনে কবির 'ডাকঘর' নাটক অভিনীত হইল। এই অভিনয়ে বালগঙ্গাধর তিলক, আনি বেশান্ত, গান্ধীজী, মদনমোহন মালবীয় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট নেতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারত সচিব ই এস মণ্টেগু শাসন সংস্কার সম্পর্কে ভারতবর্ষে আগমন করিলে জোড়াসাঁকোয় কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সার মাইকেল স্যাডলার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ শান্তিনিকেতনে গিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় ভারত সরকারের শিক্ষানীতিকে তীব্র ভাবে ব্যঙ্গ করিয়া কবি তাঁহার বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচনা 'তোতা কাহিনী' লেখেন।

গৌরলের পত্র

৯ই মে বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশের প্রাইভেট সেক্রেটারী গৌরলে এণ্ডরুজকে এক পত্র লিখিয়া জানান যে, কবি আমেরিকায় অবস্থান কালে ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া-

ছিলেন এবং তিনি জার্ম্মাণীর টাকায় আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ভারতে ইংরেজ শাসনের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া জনরব রটিয়াছে গত মহাযুদ্ধ তখনও চলিতেছে। কবি ইহারই মধ্যে পুনরায় বিদেশ যাত্রার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। গৌরলের পত্র পাঠ করিয়া তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনকে এই ঘটন লিখিয়া জানান। অতঃপর তিনি পুনরায় বিদেশ যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। কবি আমেরিকা গমন করিলে তথাকার জনসাধারণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবে কলিকাতাস্থ আমেরিকান কনসাল তাঁহাকে উহা জানাইলেও কবি তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিলেন না। জাপান ও আমেরিকায় বৃটিশ বিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগে পিয়ার্সনকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এই সংবাদেও কবি ব্যথিত হন।

১৬ই মে বহুদিন রোগে ভুগিয়া কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবী কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। ২৮শে মে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান এবং সেখানে শিক্ষকতা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

বিশ্বভারতীর গোড়া পত্তন

শান্তিনিকেতনে এশিয়ার সংস্কৃতি চর্চ্চার একটি কেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগে। ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে সর্ব্বসমক্ষে তিনি উহা ব্যক্ত করেন। ইহাই বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তন।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ

জানুয়ারী মাসে কবি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বাহির হন এবং বাঙ্গালোর,

মহীশূর, উটি, কইম্বাটুর, পালঘাট, সালেম, ত্রিচিনোপল্লী, সেরিঙ্গাপট্টম, কুম্ভকোণম, তাঞ্জোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। প্রায় প্রত্যেক সহরেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মাদ্রাজে তিনি আনি বেশান্ত প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলাররূপে বক্তৃতা দেন। কলিকাতায় ফিরিয়া এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে এক বিরাট সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। ইংরেজীতে বক্তৃতা তাঁহার এই প্রথম। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শিক্ষা'।

সার উপাধি পরিত্যাগ

রাউলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার পর কবি তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। যথোচিত সতর্ক না থাকিলে আন্দোলন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে পত্রে কবি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চলিল। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হইল। শান্তিনিকেতনে কবির নিকট এই সব সংবাদ পৌঁছিল। তিনি পাঞ্জাব যাইতে চাহিলেন কিন্তু বন্ধু বান্ধবেরা বাধা দিলেন। অতঃপর কবি কলিকাতায় আসিয়া ৩০শে মে তাঁহার সার উপাধি ফিরাইয়া দিয়া বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে এক পত্র লিখিলেন। ভারতের ইতিহাসে এই পত্রের কথা চিরকাল লেখা থাকিবে।

বিশ্বভারতী

৩রা জুলাই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তিব্বতী ও চীনা সাহিত্যে গবেষণা করিবার জন্য বিদ্যাভবন খোলা

হইল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী উহার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় কবি গান লিখিতেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পড়াইতেন। অক্টোবর নবেম্বর শিলংএ কাটাইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি দুইজন মণিপুরী শিক্ষকের দ্বারা নৃত্যকলা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিলেন। ১৯শে কার্ত্তিক কবি শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড রোণাল্ডশে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিলেন। গুজরাট সাহিত্য সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গান্ধীজীর আমন্ত্রণে কবি গুজরাট গিয়া গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে একদিন কাটাইলেন। তথা হইতে কবি গেলেন ভবনগর ও লিম্বডিতে। লিম্বডির মহারাজা শান্তিনিকেতনের জন্য কবির হস্তে ১০,০০০৲ টাকা দান করিলেন। আহমদাবাদ, বোম্বাই এবং সুরাট ভ্রমণ করিয়া কবি ৩রা মে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

আগা খাঁর সহিত আলোচনা

১১ই মে কলিকাতা হইতে পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া কবি পুনরায় বিলাত যাত্রা করিলেন। ১৫ই মে বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল। ঐ জাহাজে আগা খাঁ বিলাত যাইতেছিলেন। আগা খাঁর সহিত হাফিজ, সুফিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় কবি বহু সময় কাটাইতেন। আলোয়ারের মহারাজা এবং নবনগরের জাম সাহেব রণজিৎ সিংহও এই আলোচনায় যোগ দিতেন।

আবার লণ্ডনে

৫ই জুন কবি প্লিমাউথ বন্দরে অবতরণ করিলেন। পিয়ার্সন আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিন বৎসর পর উভয়ের এই সাক্ষাৎ। লণ্ডনে

আসিয়া কবি রথেনষ্টাইন, হাডসন, ফক্স-ষ্ট্র্যাংওয়েজ, কানিংহাম-গ্রেহাম, নিকোলাস রোয়েরিক, বার্ণার্ড শ, গিলবার্ট মারে প্রভৃতি পূর্ব্বপরিচিত সাহিত্যসেবী ও চিত্রকরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লণ্ডন হইতে কবি অক্সফোর্ড যান। অক্সফোর্ডে কর্ণেল লরেন্সের সহিত কবির পরিচয় হয়। লরেন্স তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি আরবদের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার একটিও রক্ষা করেন নাই এবং আরবদের নিকট তাঁহার আর মুখ দেখাইবার পথ রাখেন নাই। অক্সফোর্ড হইতে কবি গমন করেন কেম্ব্রিজে। সেখানে অধ্যাপক এণ্ডার্সন, লোয়েস-ডিকিন্সন, জে এম কীন্স প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলন সমিতি নামক একটি সঙ্ঘ কবির সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করে। সম্বর্দ্ধনা সভায় বিখ্যাত অভিনেত্রী সিবিল থর্ণডাইক লরেন্স বিনিয়ন কর্ত্তৃক এই উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

লণ্ডনে কবি ভারতসচিব মণ্টেগু এবং সহকারী ভারতসচিব লর্ড সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মণ্টেগুকে তিনি বুঝাইয়া দেন যে ভারতবাসী জেনারেল ডায়ারকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যগ্র নহে, বৃটিশজাতি এই অমানুষিক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিবে ইহাই তাহারা চাহে। এই সময় লর্ড চেমসফোর্ডের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিলে মণ্টেগুকে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের নিকট এক পত্র প্রেরিত হয়। কবি এই পত্রে স্বাক্ষর করেন।

সার হোরেস প্লাঙ্কেট এবং বিখ্যাত কবি এ. ই. র (জর্জ্জ রাসেল)

সহিত কবির পরিচয় হয়। ইতিমধ্যে তিনি ব্রিষ্টল সহরে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। নরওয়ে ও সুইডেন ভ্রমণের জন্য কবির মনে ইচ্ছা জাগে, যাত্রার আয়োজনও করা হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে যাত্রা বন্ধ হইয়া যায়। ৬ই আগষ্ট কবি ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হন। এবারকার ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় তাঁহার অনেক পুরাতন বন্ধু তাঁহার সহিত দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন কবি ইহা লক্ষ্য করেন। কবির বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তৃতা ছিল ইহার কারণ।

ফ্রান্সের রণক্ষেত্র দর্শন

উত্তর ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের বীভৎস ধ্বংসলীলার দৃশ্য দেখিয়া কবি অত্যন্ত ব্যথিত হন। দক্ষিণ ফ্রান্স কবির বেশী ভাল লাগিত, তিনি সেখানে গিয়া কিছুদিন কাটাইলেন। এখানে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতাটি তৈরি করেন। দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে কবি প্যারিসে আসিলে সেখানে ফরাসী মহিলা কবি কাউন্টেস নোয়েইলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। নোয়েইল কবিকে বলেন যে যুদ্ধ ঘোষণার দিন তিনি ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেঁসোঁর সহিত ছিলেন। সেদিনকার সেই প্রবল উত্তেজনা ভুলিবার জন্য তাঁহারা দুইজনে গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিতে থাকেন। গীতাঞ্জলি ফ্রান্সের শিক্ষিত সমাজে যে কতখানি আদরণীয় হইয়াছিল ইহা তাহারই নিদর্শন।

হল্যাণ্ড হইতে আমন্ত্রিত হইয়া কবি তথায় গমন করিলেন। হেগ, লিডেন ও উট্রেক্ট সহরে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করিলেন।

ডাচ জনসাধারণ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল। পুনরায় আমেরিকা যাত্রার জন্য ইচ্ছুক হইয়া কবি জে, বি, পণ্ডকে পত্র লিখিয়া আমেরিকায় তাঁহার বক্তৃতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইবে কি না জানিতে চাহিলেন। পণ্ড জানাইলেন যে আমেরিকার জনমত তখন কবির পক্ষে অনুকূল নয়, কাজেই ঐ সময় তাঁহার পক্ষে সেখানে না যাওয়াই ভাল।

হল্যাণ্ড হইতে বেলজিয়ামের ব্রুসেলস ও এণ্টোয়ার্প সহর ভ্রমণ করিয়া কবি প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রুসেলসে বেলজিয়ামের রাজা স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ইউরোপে অবস্থান কালে কবি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার চিঠি পত্র কিছুতেই সময় মত পাইতেন না। কবি ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। আমেরিকার জনমত তাঁহার অনুকূল নহে জানিয়াও কবি আমেরিকা যাওয়া স্থির করিলেন। প্রাচ্যের বাণী আমেরিকাবাসীদের শুনাইতেই হইবে এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। পিয়ার্সনকে সঙ্গে লইয়া ২৮শে অক্টোবর কবি নিউইয়র্ক পৌছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অসহযোগ

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর গান্ধীজী মৌলানা শৌকৎ আলীকে সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতনে গমন করেন। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও গান্ধীজীর আগমনের পর স্থির করিলেন যে তাঁহারাও ছাত্রদের আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন

পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠাইবেন না। কলিকাতার বহু কলেজের ছাত্রও আন্দোলনে যোগ দিয়া কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদেরই কয়েকজন আসিয়া সুরুলে গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

আমেরিকায়

ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছিলে সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ আসিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অসহযোগ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কবি সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে তিনি আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী, পশুবলের উপর তাঁহার কোন আস্থা নাই। ১০ই নবেম্বর কবি ব্রুকলীন সঙ্গীত একাডেমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দুইদিন পর তিনি ফিলাডেলফিয়ার ব্রেনার নারী কলেজে 'বাঙ্গলার মরমী কবি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রিন্সটাউন সহরে একটি ফুটবল ম্যাচ দেখিয়া নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেখানে ন্যাশনাল আর্ট ক্লাবের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। ২০শে নবেম্বর নিউইয়র্কে 'কবির ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদা তুলিতে গিয়া কবি এবার আমেরিকায় প্রতি পদে পদে বাধা অনুভব করিতে লাগিলেন। কবি বৃটিশ বিরোধী এবং জার্ম্মেণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন এই বলিয়া অত্যন্ত সঙ্গোপনে ও সতর্ক ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীর মন বিষাক্ত করিয়া তুলিবার জন্য এবার প্রবল চেষ্টা হইতে লাগিল। টাকা তুলিতে গিয়া তিনি উহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন। নিউ ইয়র্কে এক বক্তৃতায় তিনি মনের

আবেগ চাপিতে না পারিয়া তাঁহার এই নৈরাশ্যের কথা বলিয়া ফেলিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি শিকাগো চলিয়া যান এবং টেক্সাসে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া ১৯শে মার্চ্চ ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইউরোপে

বিশ্বভারতীর কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হইবার পর হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের বাণী কবির অন্তর মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমেরিকাবাসীদের এই মিলনের বাণী শুনাইয়া ইউরোপে আসিয়াও কবি ঐ বিষয়েই বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করিলেন। ৮ই এপ্রিল লণ্ডনের অধিবাসীগণকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের বাণী শুনাইলেন।

তিন সপ্তাহ লণ্ডনে কাটাইয়া কবি বিমানপোত যোগে প্যারিস গমন করিলেন। ১৭ই এপ্রিল রোমাঁ রোলাঁর সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল। ২৫শে এপ্রিল কবি প্যারিসে একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতীয় জনসাধারণের দায়িত্ব বোধ'। শ্রীধর রাণা নামক প্যারিসের এক ভারতীয় জহরৎ ব্যবসায়ী কবিকে বিশ্বভারতীর জন্য একটি চমৎকার লাইব্রেরী উপহার দিলেন।

২৭শে এপ্রিল কবি ষ্ট্রাসবুর্গ সহরে উপস্থিত হন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ৩০শে এপ্রিল জেনেভায় রুশো-ইনষ্টিটিউটে তিনি 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জার্ম্মেণীর সর্ব্বত্র তাঁহার ৬১তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লুসার্ণ ও বাস্‌ল সহর পরিদর্শন করিবার পর ১১ই মে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা করেন। ২০শে মে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৩শে মে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা করেন।

ডেনমার্ক হইতে সুইডেন গমন করিলে কবি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। উপসালার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেন। এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া কবিকে সভাক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন উপসালার আর্চবিশপ। ষ্টকহলমে সুইডিস একাডেমি কবির সম্মানার্থে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। সুইডেনের রাজা কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

সুইডেন হইতে কবি ফিরিয়া আসেন বার্লিনে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুইটি বক্তৃতা করেন। এই সভায় বার্লিনবাসীগণও তাঁহাকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়েও কবি বক্তৃতা করেন। এখানে টমাস ম্যানের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর তিনি বক্তৃতা করেন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভিয়েনা ও প্রাগ পরিদর্শন করিয়া কবি প্যারিস গমন করেন। ১লা জুলাই প্যারিস ত্যাগ করিয়া তিনি মার্সাই বন্দরে ভারতগামী জাহাজ 'মোরিয়ায়' ওঠেন এবং ১৬ই জুলাই বোম্বাই বন্দরে উপনীত হন।

শিক্ষার মিলন ও শিক্ষার বিরোধ

বোম্বাই হইতে কবি সোজা চলিয়া যান শান্তিনিকেতনে। অসহযোগের বন্যা তখন দেশের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কবিকে আন্দোলনে টানিয়া নামাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা সুরু হইল। কিন্তু অসহযোগের বাণী কবির অন্তরকে স্পর্শ করিল না। ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক আহূত

এক জনসভায় 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবি নিজের অভিমত ব্যক্ত করিলেন। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন ঐ সভার সভাপতি। প্রবন্ধটিতে কবি বলেন, 'মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় ব'লেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশনালিজম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডী-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির জোগান্ চল্‌তে লাগ্‌ল। যতদিন বিদেশী বলি জুট্‌ত ততদিন কোন কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্য স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি প'ড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগ্‌তে আরম্ভ হোলো— 'একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না।' এ যখন একদিন পূর্ব্বদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং 'ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি' ধরি' চিবায় সমস্ত'— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, এর পূজা আমাদের বংশে সইবে না। যুদ্ধ যখন পূরোদমে চল্‌ছিল তখন সকলেই ভাব্‌ছিল যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিট্‌ল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধি-পত্রের মুখোস প'রে। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁৎকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে, বোঝা যাচ্ছে উদ্ধত আগুন যখন ধরবে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকী থাকবে

না।—পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলেছেন যে, যে-দুর্ব্বুদ্ধি থেকে ঘটনার উৎপত্তি, এত মারের পরও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। ···এই দুর্ব্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজ্‌ম, দেশের সর্ব্বজনীন আত্মম্ভরিতা।

"বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।

"স্বদেশের গৌরব বুদ্ধি আমার মনে আছে, সেই জন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জ্জনা ভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশে সেই হুকুম জাগতে সুরু করেছে, আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন ক'রে আজ যুগান্তরের প্রত্যূষেও তামসী পূজা-বিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাত-রশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

"এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়-লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।

"আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্ব ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে

বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে।"

১৮ই আগষ্ট আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে এক জনসভায় কবি পুনরায় এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জাতীয়তাবাদের যে রূপ কবির তীক্ষ্ণ লেখনীমুখে প্রকাশিত হইল বাঙ্গলার একদল লোক তাহা সহিতে পারিল না। তাহাদের হইয়া ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কবির উক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন।

সত্যের আহ্বান

২৯শে আগষ্ট কবি আবার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভায় 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গান্ধীজীর অসহযোগের অসারতা প্রমাণ করিলেন।

কবি লিখিলেন, "১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি বাঙালীকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্ম্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

"দেশের যে-কোনো উন্নতিসাধনের জন্যে যে উপলক্ষ্যে আমরা ইংরেজ-রাজ-সরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষ্যেই আমাদের নৈষ্কর্ম্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ ইংরেজ-রাজ-সরকারের কীর্ত্তি আমাদের কীর্ত্তি নয়, এই জন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্ত্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই।

"বঙ্গ বিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব।...প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য্য উদ্বোধন, এর কিছু স্বর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি,—প্রকাশই হচ্চে মুক্তি।...এতদিন পরে আমার দেশে সেই মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিষ দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাই এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ঙ্কর তাগিদ দিয়েছে।...বর্ত্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্ত্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে উঠে।...দেখতে পাচ্চি এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আরেক পক্ষের

লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

"কেন বাধ্যতা? আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না, তাদের পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।...কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্ত্তী কোন একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে একথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হোলো অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হোলো, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হোলো না? এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করিনে? কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তাহোলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

"স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহু বিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কাল সাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যাঁরা যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্র-তত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্ম্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে

দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্ব্বদা নির্ম্মল ও নিরভিভূত থাকে—কোন গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়। এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে?… মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন…কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতা কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা!' এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক? বিশ্ব প্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্ম্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না তাদের বন্দীদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেই জন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে চূড়ান্ত শক্তির দাবী করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে।…চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকার সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিষটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।…কাপড় পোড়ানোর হুকুম আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না।…যে-কলের

দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধ বাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেন না তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই—তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।"

গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে 'গ্রেট সেণ্টিনেল' শীর্ষক প্রবন্ধে উহার উত্তর দেন।

৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী কলিকাতায় আসিয়া জোড়াসাঁকের বাটীতে কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে কবি ও গান্ধীজীর মধ্যে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। এই আলোচনায় বাহিরের লোকের মধ্যে এক-মাত্র এণ্ডরুজ উপস্থিত ছিলেন।

২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর কবির জোড়াসাঁকো ভবনে তাঁহার নূতন ধরণের গীতিনাট্য বর্ষামঙ্গল অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে কবি স্বয়ং কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মৃদঙ্গ বাজান।

পাঁচ বৎসর পর পিয়ার্সন এই সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার কয়েক দিন পরেই এল্‌ম্‌হার্ষ্ট শান্তিনিকেতনে আসেন। সুরুলে গ্রাম উন্নতি কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য শ্রীমতী ষ্ট্রেট নাম্নী এক মহিলা বার্ষিক ৫০০০০৲ টাকা দান করেন, এল্‌ম্‌হার্ষ্ট এই দানের সংবাদ লইয়া আসেন। শ্রীমতী ষ্ট্রেটের সহিত পরে এল্‌ম্‌হার্ষ্টের বিবাহ হয়। ১০ই নবেম্বর অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী শান্তিনিকেতনে আগমন করেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা

২২শে ডিসেম্বর ১৯২১, ৮ই পৌষ, ১৩২৮, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসব সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয়। কবি শান্তিনিকেতনের সমস্ত জমি, বাড়ী, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সম্পত্তি ট্রাষ্ট ডীড করিয়া বিশ্বভারতীর হস্তে অর্পণ করেন। নোবেল পুরস্কারে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা এবং নিজের সমুদয় বাঙ্গলা পুস্তকের স্বত্ব তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেন।

মুক্তধারা

১৯২২ সালের ১৬ই জানুয়ারী কবি তাঁহার নবচরিত 'মুক্তধারা' নাটকটি কলিকাতার বাসভবনে বন্ধুদের সমক্ষে পাঠ করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বভারতীর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মুক্তধারা' নাটক অভিনয়ের আয়োজনে হস্তক্ষেপ করিবার পর সংবাদ আসে যে গান্ধীজী রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই সংবাদে কবি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। সে দিনটি ছিল ১০ই মার্চ্চ।

৭ই মে তাঁহার দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব নীরবে বিনা আড়ম্বরে শান্তিনিকেতনে প্রতিপালিত হয়। ৮ই জুলাই কলিকাতায় শেলী শতবার্ষিকী উৎসবে কবি সভাপতিত্ব করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি সভায় তিনি একটী অপূর্ব্ব কবিতা পাঠ করেন। এই জুলাই মাসেই কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক ছাত্র সভায় কবি বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

'উদয়ন'

১৬ই সেপ্টেম্বর আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে এবং পরদিন ম্যাডান রঙ্গমঞ্চে 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়।

আবার দক্ষিণ ভারতে

১৯শে সেপ্টেম্বর কবি বোম্বাই গমন করেন এবং তথা হইতে পুণা যান। সেখানে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

পুণা হইতে বাহির হইয়া কবি মহীশূর, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কইম্বাটুর, কলম্বো, ত্রিবান্দ্রম ও কোচিন ভ্রমণ করেন। এই সব স্থানে তিনি ভারতীয় ইতিহাস, বর্ত্তমান যুগের ধারা, প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সব সহরে কাটাইয়া ২৩শে অক্টোবর কবি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন। বোম্বাই হইতে আহমদাবাদ হইয়া তিনি সবরমতী আশ্রমে গমন করেন। প্রায় তিনমাস এই ভাবে বাঙ্গলার বাহিরে কাটাইয়া কবি সবরমতী হইতে শান্তি-নিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

২২শে ডিসেম্বর কবির দ্বিতীয় ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

রক্ত-করবী

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবি সিন্ধুদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া করাচী ও হায়দরাবাদ পরিদর্শন করেন।

এপ্রিল মাসে ইংরেজিতে বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক প্রকাশ আরম্ভ

শান্তিনিকেতনে বিদেশী অভ্যাগতদের বাসের সুবিধার জন্ম

একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণকল্পে সার রতন টাটা ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ তারাপুর-ওয়ালা উহার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অতিথিশালার নাম হয় রতন কুঠি। এই বৎসর গ্রীষ্মকাল কবি শিলং-এ যাপন করেন এবং সেখানে 'রক্ত-করবী' নাটকটি রচনা করেন। কলিকাতা ফিরিয়া ২৮শে জুন ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কবি একটি বক্তৃতা দেন।

ঐক্যের পথ নির্দ্দেশ

কবি এই সময় হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হউক ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাতই এই বিরোধের মূল কারণ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। অর্থনৈতিক স্বার্থের মিলন ঘটিলেই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ দূর হইয়া যাইবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জুলাই সংখ্যায় 'ঐক্যের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'বিসর্জ্জন' নাটক অভিনীত হয়। বৃদ্ধ কবি তরুণ জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয়ের দ্বারা দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন।

কলিকাতা হইতে কবি ফিরিয়া যান শান্তিনিকেতনে। কয়েক-দিনের মধ্যেই সংবাদ আসে যে ইতালিতে এক ট্রেণ দুর্ঘটনায় পিয়ার্সনের মৃত্যু হইয়াছে। পিয়ার্সনকে কবি আন্তরিক ভাল-

বাসিতেন ; এই দুঃসংবাদে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। শান্তি-নিকেতনে পিয়ার্সনের নামে একটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কবি চাঁদা সংগ্রহের আয়োজন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি আবেদন প্রচার করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইয়া কবি সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

চীনে

১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ্চ কবি চীন যাত্রা করেন। তাঁহার সহযাত্রী হন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু এবং কালিদাস নাগ। কবির এই চীন জাপান ভ্রমণের আংশিক ব্যয় বহন করেন শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা। বিড়লা এই উদ্দেশ্যে ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। চীন যাত্রার পথে কবি রেঙ্গুন, পেনাং, কুয়ালা লামপুর এবং সিঙ্গাপুরে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। ১২ই এপ্রিল কবি সাংহাই বন্দরে পদার্পণ করিলেন। এখানে কবি সকলকে বুঝাইয়া দেন যে চীন ও ভারতের মৈত্রীবন্ধন মানুষের প্রতি মানুষের স্বার্থ লেশহীন প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১৭ই এপ্রিল জাপানীদের এক সভায় তিনি জাপানী সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভের নিন্দা করেন এবং বলেন যে এশিয়া পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত থাকুক ইহাই তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। এংলো আমেরিকান সোসাইটির এক সভাতেও তিনি এই মর্ম্মেই বক্তৃতা করেন। কবির এই সব উক্তিতে ইংরেজ ও আমেরিকান সংবাদপত্র-গুলি ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখে। চীনের

আধুনিক কালের যে-সব ছাত্র পাশ্চাত্য ভাবে ভরপূর হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাও কবির উক্তিতে সন্তুষ্ট হয় নাই।

২২শে এপ্রিল কবি পিকিং পৌঁছিলেন। ২৬শে এপ্রিল পিকিং-এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল। চীনের যুব আন্দোলনের নেতা ডাঃ হু হ্সি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কবির অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন এবং চীনা ছাত্রদের বুঝাইয়া দিলেন যে দূর হইতে কবির কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছে। এশিয়ায় কোন্ সংস্কৃতির অভ্যুদয় কবি দেখিতে চাহেন তাহা উপলব্ধি করিয়া চীনা ছাত্রেরা কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। চীনদেশে আরও কয়েকটি বক্তৃতা করিয়া কবি রওনা হইলেন জাপানে।

জাপানে

জাপানে কবি আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। মুক্তকণ্ঠে তিনি স্বীকার করেন যে জাপানীদের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু জাপান যখন অপর দেশের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে গিয়া মিথ্যা ও নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করে তখন তিনি বেদনা বোধ করেন।

২১শে জুলাই কবি দেশে ফিরিয়া আসেন।

লর্ড লিটনের বক্তৃতা

ঢাকায় পুলিশের প্রশংসা করিতে গিয়া লর্ড লিটন বাঙ্গলার নারী সমাজ সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করেন। এই বক্তৃতায় দেশে তুমুল

বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। কবিও উহার ভিতর জড়াইয়া পড়েন। লর্ড লিটন যাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পান সেজন্য কবিকে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। এই সাক্ষাৎ ঘটাইবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন মৌলবী ফজলুল হক। ২৩শে আগষ্ট লর্ড লিটন তাঁহার বক্তৃতার কৈফিয়ৎ দিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে একটি পত্র প্রকাশ করেন, কবির একটি পত্রও ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ইহাতেও কিন্তু আন্দোলন থামিল না। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি লর্ড লিটনকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি লাট সাহেবকে জানাইয়া দেন যে দেশের লোক বাঙ্গলার নারী সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়া ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ করিতে প্রস্তুত।

দক্ষিণ আমেরিকায়

১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের স্বাধীনতালাভের শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য কবির নিকট আমন্ত্রণ আসিল। কবি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ১৯শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জাহাজে কবি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, অসুস্থ দেহে তিনি অবতরণ করিলেন আর্জেনটিনের রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সে। বাধ্য হইয়া সেখানেই তাঁহাকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইল; পেরুর উৎসবে যোগদান করা তাঁহার আর হইল না। বুয়েনস আয়ার্সের জনসাধারণ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল, তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিল। কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

নাম্নী এক মহিলার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সান ইসাডোর নামক স্থানে এক চমৎকার বাগান বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই বাগানবাড়ীতে 'পূরবী' রচিত হয়। ৩০শে ডিসেম্বর আর্জ্জেনটিনের সভাপতি কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ইউরোপে

১৯২৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী কবি দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এক ইতালিয় জাহাজে উঠিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। ২১শে জানুয়ারী তিনি আসিয়া পৌছিলেন জেনোয়ায়। কবি মিলানে আগমন করিলে সেখানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইল। মিলানের ডিউক এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং কবি সঙ্গীত সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিলেন। বিখ্যাত ইতালিয় চিত্রকর রিত্তি কবির একটি চিত্র অঙ্কন করিলেন।

২৯শে জানুয়ারী কবি ভেনিস পৌছিলেন। ভেনিসের অধিবাসীগণ তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিল এবং তাহাদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান তাঁহাকে যত্ন সহকারে দেখাইল। কবি এ যাত্রা ইউরোপের আর কোন স্থান ভ্রমণ না করিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারী দেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার কয়েকদিন পরেই ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে পরলোকগমন করেন।

শান্তিনিকেতনে বিশপ ফিসার

২৭শে মে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়েই আমেরিকার বিশপ ফিসার শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কবি ও গান্ধীজী উভয়ের সহিতই তাঁহার পরিচয় হয়।

১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া কবি মর্ম্মাহত হন। দেশবন্ধু সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মর্ম্মস্পর্শী ক্ষুদ্র কবিতাটি রচনা করিয়া কবি পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

বুড়ী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

শোধবোধ ও গৃহ প্রবেশ

কাউণ্ট কাইজারলিং-এর অনুরোধে কবি বিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি কাইজারলিং-এর বিখ্যাত 'বুক অফ ম্যারেজ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া কবি তাঁহার 'চিরকুমার সভা' নাটকটিকে একটু অদলবদল করিয়া দেন। চিরকুমার সভার এই অভিনয় তিনি স্বয়ং দর্শন করেন। 'শোধবোধ' এবং 'গৃহ প্রবেশ' এই দুটি নাটককে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লিখিয়া দেন। 'গোড়ায় গলদ' নাটকটীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া 'শোধবোধে' রূপান্তরিত করা হয় এবং 'শেষের রাত্রি' গল্প হইতে 'গৃহ প্রবেশ' নাটকটি রচিত হয়।

চরকার সমালোচনা

গান্ধীজীর চরকা আন্দোলনে কবি যোগদান করেন নাই। এক প্রবন্ধে তিনি চরকার বিরূপ সমালোচনাও করিয়াছিলেন। আচার্য্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া কবি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিরুদ্ধে এক বক্তৃতায় মন্তব্য প্রকাশ করেন। কবি তাহার উত্তর দেন 'সবুজ পত্রে'। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন যে চরকা দ্বারা কখনও স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'স্বরাজ সাধন।' এই প্রবন্ধে কবি হিন্দু মুসলমান সমস্যা লইয়াও আলোচনা করেন।

রোমাঁ রোলাঁর ৬০তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কবি তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। ওই পত্রে কবি পাশ্চাত্য জগৎ যে ভাবে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিতেছে তাহার তীব্র সমালোচনা করেন এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বস্তুতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেন। নবেম্বর মাসে ইতালি হইতে অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি এবং অধ্যাপক টুচ্চি শান্তিনিকেতনে আগমন করেন এবং এখানে অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। অধ্যাপকদ্বয়ের মারফৎ মুসোলিনী কবিকে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারা আসিবার সময় বিশ্বভারতীর জন্য বহু পুস্তকও সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারত দার্শনিক সম্মেলনে কবি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৯২৬সালের ১২ই জানুয়ারী জেনেভার জাতি সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক এফ এস মার্ভিন শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর কবি যান লক্ষ্ণৌয়ে; সেখানে তিনি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের মধ্যেই তিনি সংবাদ পান যে শান্তিনিকেতনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কবি ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উপস্থিত হন। সেখানে ঢাকা মিউনিসিপালিটি, পিপ্‌ল্‌স এসোসিয়েসন এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কবি মানপত্র লাভ করেন। ঢাকায় বহু সভায় বক্তৃতা করিয়া কবি গমন করেন মৈমনসিংহে। সেখান হইতে তিনি যান কুমিল্লায়। এখানে কবি অভয় আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং নমঃশূদ্র সম্মেলনে যোগদান করেন।

কুমিল্লা হইতে কবি যান আগরতলায়। ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ আগরতলায় তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিবার পর ৭ই মে তাঁহার ৬৫ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে পৃথিবীর নানা জাতির লোক যোগদান করেন। এই উপলক্ষ্যে পোরবন্দরের মহারাজা শান্তি-নিকেতনের কলাভবনের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন এবং 'নটীর পূজা' নাটকটি সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়।

আবার ইউরোপে

১২ই মে কবি অষ্টমবার বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। ৩০শে মে তিনি ইতালির নেপ্‌ল্‌স্‌ বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। নেপল্‌স্‌ হইতে কবি একটি স্পেশ্যাল ট্রেণে রোম অভিমুখে রওনা হন। মুসোলিনীর আদেশে এই স্পেশ্যাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করা হয়। ৩১শে

যে কবি মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রোমবাসীদের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং পরদিন তিনি চারুশিল্প সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ও কবিকে সম্বর্দ্ধিত করে। ১১ই জুন কবি ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৩ই জুন পুনরায় মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কবি ফ্লোরেন্সে যান। সেখানে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সোসাইটি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। ১৭ই জুন ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২১শে জুন তারিখে 'গ্রাম ও সহর' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার পর লিপোভেতাকা নাম্নী এক ইতালিয়ান গায়িকা কবির তিনটি বাঙ্গলা গান গাহিয়া শোনান।

তুরিণ হইতে কবি স্বইজারল্যাণ্ডে গমন করেন। ফাসিস্ত রাজত্বে ইতালি হইতে বিতাড়িত বহু ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবি ইতালিতে যে সব উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতে মুসোলিনীর প্রশংসাসূচক কথাগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া ঐ সঙ্গে কিছু রং চড়াইয়া ইতালির সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বইজারল্যাণ্ডে কবিকে সেইগুলি দেখানো হয়। কবি ইতালিয় ভাষা জানিতেন না, কাজেই এগুলি ধরা তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জুরিখে অধ্যাপক সালভাদরির পত্নী কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সালভাদরি মুসোলিনী কর্তৃক ইতালি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কবি ফাসিস্তবাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হন এবং ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে এক পত্র লিখিয়া মুসোলিনীর ফাসিস্তবাদের নিন্দা করেন। পরে গার্ডিয়ানে আর একটি পত্র লিখিয়া কবি বলেন যে ব্যক্তিগত-ভাবে মুসোলিনীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও ফাসিস্তবাদ

তিনি সমর্থন করেন না। ভিলেনভে রোমাঁ রোলাঁ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। জর্জ্জ ডুহামেল, জে, জি, ফ্রেজার, অধ্যাপক বোভে, অধ্যাপক ফোরেল প্রভৃতি বহু মনীষীর সহিত সুইজারল্যাণ্ডে তাঁহার পরিচয় হয়। আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে কবি ইংলণ্ড গমন করেন। বিখ্যাত ভাস্কর এপষ্টাইন তাঁহার একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

২১শে আগষ্ট কবি নরওয়ে রওনা হন। অসলোতে নরওয়ের রাজার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। ষ্টকহলমে বিখ্যাত ভ্রমণকারী স্বেন হেডিন, নানসেন, এবং খ্যাতনামা লেখক বিয়র্ণসেন ও জোহান বোয়ারের সহিত কবির পরিচয় হয়।

নরওয়ে হইতে কবি যান কোপেনহেগেনে। সেখানে দার্শনিক হফডিং এবং বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক জর্জ্জ ব্রাণ্ডেসের সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

কোপেনহেগেন হইতে কবি জার্ম্মেণী যান এবং ১০ই সেপ্টেম্বর হামবুর্গ পৌছেন। পরদিন তিনি বার্লিন যান এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর কবি জার্ম্মেণীর সভাপতি ফন হিণ্ডেনবুর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ড্রেসডেনে কবির বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তারাচাঁদ রায় নামক জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উহার জর্ম্মাণ অনুবাদ করিয়া দেন। তারাচাঁদ রায় ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দিভাষার অধ্যাপক। এই সভায় কবি তাঁহার কয়েকটি ইংরেজি ও বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি করেন। ড্রেসডেনে কবির 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়।

ড্রেসডেন হইতে কবি বার্লিন আসেন এবং তথা হইতে চেকোশ্লো-

ডাকিয়া রওনা হন। অক্টোবর মাসে প্রাগে কবি 'সভ্যতা ও প্রগতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রাগ হইতে তিনি এরোপ্লেনে ভিয়েনা যান। জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য এরোপ্লেনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভিয়েনায় তাঁহাকে বিরাট অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে তিনি 'বনবাণীর' কবিতাগুলি রচনা করেন। ২৬শে অক্টোবর কবি বুডাপেষ্টে বক্তৃতা করেন। বুডাপেষ্টে তিনি বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান কবি সান্ডর কিসফাল্‌দ্বির মর্ম্মর মূর্ত্তির নিকট একটি বৃক্ষ রোপণ করেন এবং হাঙ্গেরীয়ান ঔপন্যাসিক মরিস জোকাইয়ের স্মৃতিস্তম্ভের উপরে মাল্য অর্পণ করেন।

হাঙ্গেরী হইতে কবি বেলগ্রেডে গমন করেন এবং বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে তিনি যান বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায়। সোফিয়ায় তিনি রাজা বোরিসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বুলগেরিয়া হইতে কবি রুমানিয়া গমন করেন এবং বুখারেষ্টে রুমানিয়ার রাজা ফার্দ্দিনান্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

২৫শে নবেম্বর কবি এথেন্সে উপস্থিত হন। সেখান হইতে তুরস্ক হইয়া তিনি যান মিশরে। ২৭শে নবেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া এবং ১লা ডিসেম্বর তিনি কাইরো পৌছেন। কাইরোতে কবিকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য মিশরীয় পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। মিশরের মন্ত্রীরা এক ভোজ সভায় কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই ভোজ সভায় কবিকে আরবী সঙ্গীত শোনান হয়। কবি রাজা ফুয়াদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা ফুয়াদ তাঁহাকে বিশ্বভারতীর জন্য অনেকগুলি আরবী গ্রন্থ উপহার দেন। বিদেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া কবি আলেকজান্দ্রিয়া হইয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হন।

নটীর পূজা ও নটরাজ

কলিকাতায় পৌঁছিলে কবিকে হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ১৯২৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতায় 'নটীর পূজার' অভিনয় হয়। বেঙ্গল অর্ডিনান্সে দেশের যুবকদের বিনা বিচারে আটক রাখিবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিবার সরকারী নীতির বিরুদ্ধে এই সময় এক আন্দোলন সুরু হইয়াছিল ; কবি ঐ আন্দোলন সমর্থন না করিয়া বলেন যে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিলে সে পাল্টা জবাব দিবে না ইহা ধারণা করাই ভুল এবং এই প্রকার আন্দোলনের কোন সার্থকতা নাই।

১৮ই মার্চ্চ শান্তিনিকেতনে কবির নূতন ধরণের নৃত্যনাট্য 'নটরাজ' অভিনীত হয়। 'নটরাজ' পরে 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত হয়।

ভরতপুরের মহারাজার আমন্ত্রণে কবি হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। জয়পুর ও আগ্রা ভ্রমণ করিয়া তিনি যান আহমদাবাদে। সেখান হইতে ১১ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। কবি চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রার্থনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন ; চন্দননগরের মেয়র তাঁহাকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেন। অতঃপর কবি শিলং গমন করেন এবং সেখানে বিচিত্রার জন্য 'তিন পুরুষ' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। 'তিন পুরুষের' নাম বদলাইয়া পরে তিনি উহার নাম দেন 'যোগাযোগ'।

বৃহত্তর ভারত ভ্রমণ

১২ই জুলাই কবি নবমবার বিদেশ যাত্রা করেন। এবার তিনি মালয়, জাভা, বলি ও শ্যাম ভ্রমণ করেন। শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা

এই ভ্রমণের আংশিক ব্যয় দশ হাজার টাকা দান করেন। ২০শে জুলাই কবি সিঙ্গাপুর পৌছেন। সেখানে গবর্ণর সার হিউ ক্লিফোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি 'মানুষের ঐক্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২৭শে জুলাই তিনি মালাক্কা রওনা হন। অনেকগুলি স্থানে বক্তৃতা দিয়া কবি পেনাং আসিয়া পৌছেন এবং সেখান হইতে সুমাত্রা রওনা হন। ২২শে আগষ্ট তিনি বাটাভিয়ায় পদার্পণ করেন। বাটাভিয়ায় তাঁহার সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত এক ভোজ সভায় 'জাভায় ভারতীয় তীর্থযাত্রী' শীর্ষক একটি কবিতা এবং 'বিজয়লক্ষ্মী' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন। 'বিজয়লক্ষ্মী' কবিতাটি তিনি পূর্ব্বদিন রচনা করিয়াছিলেন। ২৩শে আগষ্ট কবি বলি রওনা হন।

জাভা যাত্রার প্রাক্কালে কবি বিচিত্রায় 'সাহিত্যের ধর্ম্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দিয়া গিয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি বাঙ্গলা উপন্যাসে অতি আধুনিকতার সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া তুমুল বাদানুবাদ চলিতে থাকে। এই বিতর্কের সংবাদ পাইয়া কবি জাভা যাত্রী জাহাজে বসিয়া 'সাহিত্যে নবত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ২৪শে আগষ্ট তিনি বলি পৌছেন। বলি দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া কবি 'সাগরিকা' কবিতাটি রচনা করেন। 'সাগরিকা' 'মহুয়ায়' প্রকাশিত হয়। বলি ভ্রমণ কালে কবি রাজার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হন। বলি নৃত্য নাট্যের মাধুর্য্যে তিনি চমৎকৃত হন।

৯ই সেপ্টেম্বর কবি জাভা দ্বীপের সুরাবায়ায় পৌছেন। ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি সুরকর্ত্তায় পৌছেন এবং সেখানে একটি পুল ও একটি রাজপথের উদ্বোধন করেন। কবির নামে এই দুইটির নাম করণ করা হয়। বরবুদরের বিরাট মন্দির দর্শন করিয়া কবি বাটাভিয়া হইয়া শ্যাম

যাত্রা করেন। শ্যামের রাজা ও রাণী কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

৭ই অক্টোবর কবি দেশে ফিরিয়া আসেন।

শেষের কবিতা

৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' অভিনীত হয়। 'নটরাজ' নাটকটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া কবি উহার নাম দিয়াছিলেন 'ঋতুরঙ্গ'।

১৯২৮ সালের ৫ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিখ্যাত গায়িকা মাদাম ক্লারা বাটও শান্তিনিকেতনে আসেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক উইলিয়াম উইনটারনিৎসের স্থলে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক লেসনি আসেন।

সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা লইয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং কলেজে ধর্ম্মঘট হয়। কলেজের চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া সরস্বতী পূজার যে দাবী উঠিয়াছিল প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রে কবি তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে অতি আধুনিকতা লইয়া তুই দল সাহিত্যিকে যে তীব্র বিতর্ক চলিতেছিল তাহার সমাধানের জন্য কবির কলিকাতার বাসভবনে এক বৈঠক আহূত হয় এবং কবি উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

৭ই মে কলিকাতায় কবির ৬৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কবিকে একটি তুলাদণ্ডে বসাইয়া অপর দিকে তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী ওজন করা হয় এবং এই পুস্তকগুলি দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিতরণ করা হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে হিবার্ট বক্তৃতা দিবার জন্য কবি ১২ই মে বিলাত যাত্রা করেন কিন্তু মাদ্রাজ গিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিলাত যাত্রা স্থগিত রাখিতে হয়। মাদ্রাজ হইতে কবি কলম্বো গমন করেন এবং পথিমধ্যে ২৯শে মে পণ্ডিচেরীতে নামিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জুন মাসে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আমন্ত্রণে কবি সিংহল হইতে বাঙ্গালোর যান। এখানে তিনি 'শেষের কবিতা' রচনা সমাপ্ত করেন। জুনের শেষে তিনি শান্তি-নিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

আগষ্ট মাসে কলিকাতায় আসিয়া কবি ব্রাহ্ম সমাজের শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে রামমোহন রায়ের বাণী সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিলভারত লাইব্রেরী সম্মেলনে পাঠ করিবার জন্য কবি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান।

১৭ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আরউইন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন।

কানাডা ও জাপান ভ্রমণ

১৯২৯ সালে কলিকাতায় যে ধর্ম্ম মহাসম্মেলন হয়, ২৭শে জানুয়ারী কবি উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আমন্ত্রণে ২৬শে ফেব্রুয়ারী কবি কানাডা যাত্রা করেন। ২৬শে মার্চ্চ তিনি টোকিও পৌছেন এবং সেখানে বিখ্যাত জাপানী সংবাদপত্র 'আসাহি শিম্বুনের' আতিথ্য

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

মংপু, দার্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

শিশুদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্যে তোমরা রবিবার নাম দিয়ে যে নতুন সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র বের করবার সংকল্প করেছ আমি তার সফলতা কামনা করি। ইতি ২৭।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুলদা সাহিত্য মন্দির

প্রকাশিত

শিশু-সাপ্তাহিক রবিবারের প্রতি কবিগুরুর নিজের হাতে লেখা আশীর্বাদ

গ্রহণ করেন। ৬ই এপ্রিল কবি ভ্যাঙ্কুভার পৌঁছান এবং কানাডার ত্রৈবার্ষিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা 'বিশ্রামের দার্শনিক ব্যাখ্যা' প্রদত্ত হয়। পরদিন তিনি সেখানে সাহিত্যের মূলনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৪ই এপ্রিল তিনি কানাডা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ও সেই উপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা করেন।

হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, কালিফোর্ণিয়া এবং ডেট্রয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৮ই এপ্রিল কবি লস এঞ্জেলস বন্দরে পৌছেন। তাঁহার পাসপোর্টটি হারাইয়া যাওয়ায় এখানে এমিগ্রেসন অফিসারদের হাতে তাঁহাকে 'কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রাপ্য বিশেষ ব্যবস্থার' স্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এই ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্কল্প বাতিল করিয়া দেন এবং ২০শে এপ্রিল এক জাপানী জাহাজে জাপান যাত্রা করেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও যাত্রীগণ সমুদ্রবক্ষে কবির জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

১০ই মে কবি ইয়োকোহামা বন্দরে পদার্পণ করেন। তথা হইতে টোকিও গমন করিলে মার্কুইস ওকুমা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ৮ই জুন কবি স্বদেশ যাত্রা করেন। পথে ইন্দোচীনের ফরাসী গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ কবিকে অভিনন্দিত করেন। ৩রা জুলাই কবি মাদ্রাজ পৌছেন ও ৫ই জুলাই কলিকাতায় উপনীত হন।

সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের বিচার ও তপতী

প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিচয় সভার উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসে কবি সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্যের বিচার সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা

করেন।. 'রাজা ও রাণী' নাটকটি পরিবর্ত্তিত করিয়া কবি উহাকে 'তপতী' নামে নূতন রূপ দেন। ২৬শে, ২৮শে, ২৯শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর কবির জোড়াসাঁকোর বাটীতে 'তপতী' অভিনীত হয়। বৃদ্ধ বয়সেও কবি তরুণ রাজা বিক্রমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

যুযুৎস্থ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা

বাঙ্গালীর আত্মরক্ষায় অক্ষমতা দেখিয়া কবি দুঃখিত হইতেন। যুবক যুবতীদের যুযুৎস্থ শিখাইয়া বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য কবির অতিশয় আগ্রহ ছিল। জাপান হইতে তাগাগাকি নামক জনৈক যুযুৎস্থ শিক্ষককে তিনি শান্তিনিকেতনে আনাইয়া তথায় যুযুৎস্থ শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

চিত্রাঙ্কনে অনুরাগ

কবির মনে এই সময়ে চিত্রাঙ্কনের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে। প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি চিত্রাঙ্কণ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কবি বরোদার গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে বরোদা যান এবং সেখানে 'শিল্পী মানুষ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু বরোদা হইতে আসিবার সময় পথে অনিবার্য্য কারণে আটকাইয়া পড়ায় তিনি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিলেন না। শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

সুরুল সম্মেলন

১০ই ফেব্রুয়ারী সুরুলে তথাকার সমবায় কর্ম্মীদের এক সম্মেলন আহূত হয়। বাঙ্গলার লাট সার ষ্টানলি জ্যাকসন এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে শ্রীনিকেতনের উন্নতির জন্য বাঙ্গলা সরকারের তহবিল হইতে এককালীন ৫০০০৲ টাকা এবং তিন বৎসরের জন্য বার্ষিক ১০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। দেশবাসী এই সাহায্যের পরিমাণ এত সামান্য বলিয়া মনে করে যে ইহার বিরুদ্ধে দেশে রীতিমত বিক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ইউরোপ ভ্রমণ

২রা মার্চ্চ কবি পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন। ২৬শে তিনি মার্সাই বন্দরে অবতরণ করেন। এখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার সভাপতি মাসারিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ২রা মে প্যারিসে কবি নিজের অঙ্কিত ১২৫টি চিত্রের একটি প্রদর্শনী খোলেন। প্যারিসে তাঁহার ঊনসপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই মে কবি লণ্ডনে পৌছেন এবং তথা হইতে বার্ম্মিংহাম যান। এখানে আসিয়া তিনি দেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার সংবাদ পান। ১৬ই মে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি দেশে সরকারী দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন। ১৭ই মার্চ্চ তিনি অক্সফোর্ড পৌছেন এবং ১৯শে ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে হিবার্ট বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা করেন। অক্সফোর্ড হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া কবি তদানীন্তন ভারত সচিব ওয়েজউড বেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এখানে কোয়েকারদের বার্ষিক সভায় কবি একটি বক্তৃতা করেন। কোয়েকার সম্প্রদায়ের এইরূপ সভায় কোয়েকার ভিন্ন অপর কেহ বক্তৃতা করিবার রীতি নাই; গত ২৫২ বৎসরের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ এই প্রকার সভায় বক্তৃতা করেন নাই। বক্তৃতার শেষে ভারতে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে কবির মন্তব্যের বিরুদ্ধে সভাক্ষেত্রে হট্টগোল আরম্ভ হয়। কবি তখন বলেন, "আমাদের স্থানে আপনাদের নিজেদের কল্পনা করুন এবং স্মরণ করুন সেই দিনের কথা যেদিন আমেরিকায় আপনাদেরই স্বজাতিবর্গ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেও দ্বিধা করে নাই।" উপযুক্ত উত্তর পাইয়া হট্টগোলকারী শ্রোতারা স্তব্ধ হয়।

২৬শে মার্চ্চ কবি পুনরায় অক্সফোর্ডে যান এবং হিবার্ট বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের ধর্ম্ম'। এই সভায় অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হইয়াছিল। সভার শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ সার মাইকেল স্যাডলার বলেন, "আপনার দান এবং আপনার উৎসাহপূর্ণ বাণীর কথা অক্সফোর্ডবাসী আমরা কখনও ভুলিব না।" বার্মিংহামে ফিরিয়া কবি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২রা জুন এখানে নিজের অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী খোলেন। ৭ই জুন স্পেক্টেটরে এক পত্র লিখিয়া মহাত্মা গান্ধীর অহিংস বিপ্লবের নূতন পন্থার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

অতঃপর জার্ম্মেণী যাত্রা করিয়া কবি ১১ই জুলাই বার্লিন পৌঁছেন। পরদিন রাইশষ্টাগের সদস্যদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৪ই আইনষ্টাইনের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। ১৬ই এখানে তাঁহার চিত্রাবলীর প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। তারপর ড্রেসডেন হইয়া কবি

উপস্থিত হন মিউনিকে। মিউনিকের প্রাচীন টাউন হলে নগরবাসীগণ কর্তৃক কবি সম্বর্দ্ধিত হন। রাজ সম্মানের সহিত জার্ম্মেণীর অনেকগুলি সহরে ভ্রমণ করিয়া কবি পৌছান ডেনমার্কে।

৯ই আগষ্ট কোপেনহেগেনে কবির অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী খোলা হয়।

কোপেনহেগেন হইতে জেনেভা হইয়া কবি রাশিয়া যাত্রা করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি মস্কো সহরে পদার্পণ করেন। পরদিন তাঁহাকে এক প্রকাশ্য সভায় সম্বর্দ্ধিত করা হয়। অনাথদের কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য মস্কোতে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ১৪ই তিনি তাহা পরিদর্শন করেন। ১৭ই মস্কোর সরকারী মিউজিয়ামে তাঁহার চিত্রাবলীর প্রদর্শনী খোলা হয়। সোভিয়েট শিল্প সমালোচকেরা কবির চিত্রাঙ্কনকে পৃথিবীর চিত্রবিদ্যার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করেন। মস্কোর সরকারী অপেরা গৃহে কবি 'প্রথম পিটার', 'রেসারেকসন' এবং 'বিয়াডারকা' নামক ভারতীয় প্রেমমূলক আখ্যান অবলম্বনে রচিত একটি নাটকের অভিনয় দর্শন করেন। ছাত্রদের এক সভায় তিনি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মস্কোর বহু প্রতিষ্ঠান দর্শন করিয়া ২৪শে সেপ্টেম্বর ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আফিসে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভায় কবি রাশিয়ার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর রাশিয়া হইতে রওনা হইয়া কবি জার্ম্মেনীতে উপস্থিত হন।

আমেরিকা ভ্রমণ

৩রা অক্টোবর কবি জার্ম্মেণী হইতে আমেরিকা রওনা হন। ২৫শে নবেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত বিল্‌ট্‌মোর হোটেলে নিউইয়র্ক সহরের

শ্রেষ্ঠ চারিশত জন নাগরিকের উদ্যোগে কবিকে এক বিরাট ভোজসভায় সম্বর্দ্ধিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি হুভারের সহিত কবির পরিচয় হয়। ১লা ডিসেম্বর কার্ণেগী হলে কবি একটি বক্তৃতা করেন। ৭ই ডিসেম্বর বাহাই সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আহূত এক সভায় তিনি পারস্যের প্রথম ও শেষ মহাপুরুষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নিউইয়র্ক এবং বোষ্টনে কবির অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী খোলা হয়।

২২শে ডিসেম্বর কবি আবার ইংলণ্ডে গমন করেন। গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া যে দর কষাকষি চলিতেছিল তাহাতে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে কবি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৩১ সালের ৮ই জানুয়ারী স্পেক্টেটর সম্পাদকের উদ্যোগে এক ভোজসভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয় এবং সেখানে বার্ণার্ড শ'র সহিত কবি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে কবি দেশে ফিরিয়া আসেন।

রাশিয়ার চিঠি

দেশে ফিরিয়া কবি নূতন ধরণের নৃত্য-নাট্য 'নবীন' রচনা করেন। প্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে ১৪ই মার্চ্চ কলিকাতা এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'নবীন' অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং কবিতা আবৃত্তি করেন এবং নৃত্য ও আবহসঙ্গীত কবিতাকে রূপায়িত করিয়া তোলে।

শান্তিনিকেতনে এবং ভারতের বহু স্থানে কবির সপ্ততিতম জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়া হইতে কবি যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি সংগৃহীত হইয়া এই দিনে রাশিয়ার চিঠি নামে পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হয়। বিপ্লবের পর রাশিয়া তাহার সমাজ জীবনে যে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, কবির লেখনী মুখে তাহা এই চিঠিগুলিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন

১৬ই মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় কবির সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয় এবং স্থির হয় পরে কলিকাতায় সাড়ম্বরে একটি জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। জয়ন্তী উৎসবের আয়োজনের ভার একটি কমিটির উপর অর্পিত হয়। জগদীশচন্দ্র বসু কমিটির সভাপতি, যতীন্দ্রনাথ বসু সাধারণ সম্পাদক এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অমল হোম যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

উত্তর বঙ্গের বন্যা

১৯৩১ সালের বর্ষাকালে এক ভয়াবহ বন্যায় উত্তর বঙ্গের বহু স্থান ভাসিয়া যায় এবং ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীগণের দুর্দ্দশার চরম হয়। এই সময় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কবি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং প্রবাসীতে এক প্রবন্ধে লেখেন, এই দাঙ্গার ফলে যে তৃতীয় পক্ষ এদেশের পরাধীনতা কায়েম রাখিতে চায় তাহাদেরই সুবিধা হইবে। উত্তর বঙ্গের বন্যায় সাহায্যার্থে টাকা তুলিবার জন্য ২৪শে, ২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় নূতন ধরণের গীতি নাট্য 'শিশুতীর্থ' অভিনীত হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর সংস্কৃত কলেজ রবীন্দ্রনাথকে কবি-সার্ব্বভৌম উপাধিতে ভূষিত করেন।

হিজলী গুলিচালনার প্রতিবাদ

১০ই অক্টোবর কবি যখন দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন সেই সময় পথিমধ্যে তিনি সংবাদ পান যে হিজলী বন্দীশিবিরে প্রহরীদের গুলিতে দুইজন বন্দী নিহত এবং অনেকে আহত হইয়াছেন। এই ঘটনায় বাঙ্গলাদেশে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। হিজলী গুলিচালনার প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন করা হয় কিন্তু সভায় এত বেশী লোক সমাগম হইয়াছিল যে টাউন হলের পরিবর্ত্তে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের পাদদেশে ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কবি উহাতে যোগদান করেন এবং সমগ্র দেশের ক্ষোভ তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে। অন্ধকার রাত্রিতে নিরস্ত্র আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিনাবিচারে বন্দী এই যুবকগণের উপর অতর্কিতে এই প্রাণঘাতী আক্রমণের তিনি তীব্রভাষায় নিন্দা করেন।

বাঙ্গলাদেশ যাহাতে বোম্বাইয়ের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের উপরেই বস্ত্র সম্বন্ধে নির্ভরশীল হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বাঙ্গলার তাঁতের উন্নতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। কবি উহা সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

দার্জ্জিলিং-এ কিছুদিন কাটাইয়া ২৩শে ডিসেম্বর কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করেন। ২৫শে ডিসেম্বর হইতে এক সপ্তাহকাল জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে একটি প্রদর্শনী ও একটি মেলা হয়। প্রদর্শনীতে কবির অঙ্কিত একশত চিত্র, তাঁহার বাঙ্গলা ও ইংরেজী গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন সংস্করণ, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত

তাঁহার গ্রন্থাবলী, নিজের সম্বন্ধে লেখা, তাঁহার বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন দেশ হইতে প্রাপ্ত উপহার, বিশ্বভারতীর ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য, বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন ও আধুনিক ললিতকলা ও শিল্পকলার নিদর্শন, বেঙ্গল স্কুল অফ্ পেন্টিংয়ে অঙ্কিত চিত্রাবলী, ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী ব্যতীত একটি মেলাও হয়। মেলায় বিবিধ প্রকারের কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হয় এবং কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউল গান, গ্রাম্য সঙ্গীত ও নৃত্য, ক্রীড়া প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহাকে সাহায্য করেন সুরেন্দ্রনাথ কর। মেলার ভার ছিল জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উপর। অপরাহ্নে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনে বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। সন্ধ্যায় কবির রচিত বাছা বাছা ৩৫টি সঙ্গীত বিশিষ্ট গায়ক গায়িকাগণের দ্বারা গীত হয়। ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন।

২৬শে ডিসেম্বর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের সভাপতিত্বে আর একটি সম্মেলন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীগণ আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দান সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সন্ধ্যায় আবার সঙ্গীতের আসর বসে এবং কবির আরও ৩৫টি সঙ্গীত গীত হয়।

২৭শে ডিসেম্বর টাউন হলের সম্মুখে এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দিত করা হয়। কলিকাতা

কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তৎকালীন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তৎকালীন সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে এলাহাবাদের প্রতিভা দেবী এবং জনসাধারণের তরফ হইতে রবীন্দ্র জয়ন্তী পরিষদের পক্ষে কবি কামিনী রায় মানপত্র পাঠ করেন। জয়ন্তী পরিষদের মানপত্রখানি লিখিয়া দেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবি একত্রে সব কয়খানি অভিনন্দনের উত্তর দেন। জয়ন্তী পরিষদের প্রচার সমিতির পক্ষ হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর' উপহার দেন।

২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর কবির জোড়াসাঁকোর বাটীতে 'নটীর পূজা' অভিনীত হয় এবং কবি স্বয়ং বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কলিকাতার ছাত্রেরাও জয়ন্তী উৎসবে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করে এবং সিনেট হলে এক বিরাট সভায় কবিকে অভিনন্দিত করে। ছাত্রদের এই সভায় কবি একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং উহাতে তিনি নিজের কবি জীবনের ক্রম বিকাশের কাহিনী ব্যক্ত করেন। ৩১শে ডিসেম্বর জয়ন্তী উৎসব শেষ হইবার কথা ছিল কিন্তু উৎসবের দিন আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ৫ই জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং মেলার সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গ্রেপ্তারের সংবাদ আসিবার পর জয়ন্তী উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ইরাণ ভ্রমণ

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ভারত সরকারের বেপরোয়া দমন নীতির প্রতিবাদ করিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী

রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে টেলিগ্রাম করেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কবি একটি বিবৃতি দেন কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের সেন্সর উহার সবখানি প্রকাশিত হইতে দেন নাই। এই সময় কিছুকাল কবি খড়দহে গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন এবং সেখানে গান্ধীজী সম্বন্ধে 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে মুকুল দে কবির চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী খোলেন। প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন কবি সেখানে উপস্থিত হন।

ইরাণের শাহের আমন্ত্রণ পাইয়া কবি বিমানযোগে ইরাণ যাত্রার সঙ্কল্প করেন। যাত্রার পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে আগত ইংলণ্ডের 'সোসাইটী অফ ফ্রেণ্ডস'-এর এক প্রতিনিধিদলের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন।

১১ই এপ্রিল দমদম হইতে ডাচ বিমানপোতে কবি ইরাণ যাত্রা করেন। শিরাজ সহরে তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। কবি হাফিজের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইরাণের প্রাচীন নগরী পার্সেপোলিস হইয়া কবি ২৩শে এপ্রিল ইস্পাহানে উপস্থিত হন। তথা হইতে কবি যান তেহেরাণে। তেহেরাণে শাহ রেজা শাহ পহলবীর আদেশে বিরাট আড়ম্বরের সহিত তাঁহার দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইরাক হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া কবি বোগদাদ যান এবং সেখানে রাজা ফৈজলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বোগদাদের নাগরিকবৃন্দ কবিকে অভিনন্দিত করেন।

৩রা জুন বিমানপোতযোগে কবি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি বাঙ্গলা সাহিত্যে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে এবং কমলা বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হন। ৬ই আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রের সম্পাদক চিরভূরি যজ্ঞেশর চিন্তামণি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কবির মতামত জানিতে চাহিলে তিনি দেশবাসীকে যুক্তিবিহীন সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীবিভেদের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের অন্তর্ব্বিরোধ দূর করিতে এবং দেশের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে উপদেশ দেন।

শান্তিনিকেতনে বসিয়া কবি তাঁহার গদ্য কবিতা 'পুনশ্চ' এবং 'পরিশেষ' ও 'কালের যাত্রা' রচনা করেন।

গান্ধীজীর 'আমৃত্যু অনশন'

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল। কবি উহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। এমনি সময় অকস্মাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর সংবাদ আসে যে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে যারবেদা জেলে 'আমৃত্যু অনশন' আরম্ভ করিয়াছেন। কবি এই সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং পুণায় ছুটিয়া যান। গান্ধীজীকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট কবি একটি মর্ম্মস্পর্শী তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে পুণা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ২৬শে

সেপ্টেম্বর রামজে ম্যাকডোনাল্ড পুণা চুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসে এবং গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। কবি গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার প্রিয় একটি সঙ্গীত গান করেন।

২রা ডিসেম্বর মদনমোহন মালব্য শান্তিনিকেতনে আগমন করেন।

শাপমোচন

১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উৎসবে কবি সভাপতিত্ব করেন। অতঃপর তিনি সুন্দর-বনে সার ডেনিয়েল হ্যামিলটনের গোসাবা উপনিবেশ পরিদর্শন করেন।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে কবি কমলা লেকচারের দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতা সিনেট হলে রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন সভায় কবি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলন উপলক্ষ্যে কবির পুত্রবধূ শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীগণকে লইয়া নৃত্য-নাট্য 'শাপমোচন' অভিনয়ের আয়োজন করেন। মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী

পাশ্চাত্য দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতিশয় চাতুর্য্যপূর্ণ মিথ্যা প্রচার চলিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া বিঠলভাই প্যাটেল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যকথা বলিতে আরম্ভ করেন। কবি বিঠলভাইয়ের এই চেষ্টা সমর্থন করিয়া এপ্রিল মাসে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন।

এই সময় গান্ধীজী পুনরায় অনশন অবলম্বনের সঙ্কল্প করিতেছেন বলিয়া সংবাদ আসিলে কবি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন কিন্তু গান্ধীজী সেই টেলিগ্রাম পান নাই।

দেশের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি কামনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। উহাতে সর্ব্বপ্রথম স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ। আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীগণের অনশনের সংবাদ আসিলে কবি তাঁহাদিগকে অনশন ত্যাগ করিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন।

হাল নগরীতে উইলবারফোর্স শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে কবি একটি বাণী প্রেরণ করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'তাসের দেশ' অভিনীত হয় এবং কবি 'চণ্ডালিকা' হইতে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছন্দ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। 'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলি এই সময় প্রকাশিত হয়।

বোম্বাইয়ে 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ'

নবেম্বর মাসে কবি সদলবলে বোম্বাই গমন করেন। সেখানে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীগণের দ্বারা 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। কবির নিজের অঙ্কিত চিত্রাবলীর এবং বিশ্বভারতী কলাভবনের অন্যান্য শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনী খোলা হয়। বোম্বাইয়ে কবি অনেকগুলি জনসভায় বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কবি ওয়ালটেয়ার যান এবং ৮ই, ৯ই, ও ১০ই ডিসেম্বর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের সম্বন্ধ বিষয়ে

তিনটি বক্তৃতা করেন। ১২ই ডিসেম্বর কবি হায়দরাবাদ গমন করেন। হায়দরাবাদের নিজাম কবিকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতীতে ইসলাম সংস্কৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য নিজাম এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, কবির হায়দরাবাদ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি আরও পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন।

ভারত-পথিক রামমোহন

কলিকাতায় ফিরিয়া ২৯শে ডিসেম্বর রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে 'ভারত-পথিক রামমোহন' শীর্ষক কবির বিখ্যাত অভিভাষণটি প্রদত্ত হয়। টাউন হলে নিখিলভারত নারী সম্মেলনেও কবি বক্তৃতা করেন।

১৯৩৪ সালের ৩রা জানুয়ারী সরোজনী নাইডু শান্তিনিকেতনে গমন করেন।

এই সময় বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। অস্পৃশ্যতার সঞ্চিত পাপের ফলে এই ভূমিকম্প হইয়াছে, গান্ধীজী এইরূপ এক মন্তব্য করেন এবং কবি তাহার প্রতিবাদ করেন। বিহার ভূমিকম্পে সাহায্যদানের জন্য কবি পৃথিবীর সকল দেশের নিকট আবেদন করেন।

কলম্বোতে 'শাপমোচন'

৬ই মে কবি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণকে লইয়া সিংহল যাত্রা করেন। কলম্বোতে পাঁচ রাত্রি 'শাপ মোচন' অভিনীত হয়। কবির ও কলাভবনের শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনীও সেখানে খোলা হয়। ১৯শে মে পাণ্ডুরায় শ্রীনিকেতনের আদর্শে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি নামকরণ করেন এবং উহার নাম দেন শ্রীপল্লী।

মাদ্রাজ ও কাশী ভ্রমণ

পাণ্ডুরা হইতে কবি কান্দী যান এবং ৫ই জুন সেখানে তাঁহার 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি লেখা শেষ করেন। অতঃপর উত্তর সিংহল ভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজ হইয়া ২৮শে জুন কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৩১শে আগষ্ট সীমান্তের খাঁ আবদুল গফুর খাঁ কারামুক্ত হইয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহার পুত্র তখন শান্তিনিকেতনে পড়িতেন।

ববিলির রাজার আমন্ত্রণ পাইয়া কবি মাদ্রাজ গমন করেন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার নবজীবনের সহিত তাঁহার নিজের যোগাযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২৮শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত নাট্যাভিনয় হয় এবং শান্তিনিকেতনের শিল্পকলার প্রদর্শনী খোলা থাকে। ৭ই অক্টোবর কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

২রা ডিসেম্বর কবি কাশী গমন করেন এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মণ্টেসরি স্কুলের উদ্বোধন করেন। ২৭শে ডিসেম্বর কবি কলিকাতা টাউন হলে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব

১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলার লাট সার জন এণ্ডার্সন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে পুলিশ পাহারার এত কড়াকড়ি আরম্ভ হয় যে কবি উহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং আশ্রমের সকলকে শ্রীনিকেতনে পাঠাইয়া দেন। লাট সাহেব শূন্য আশ্রম পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া যান।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় কবি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে

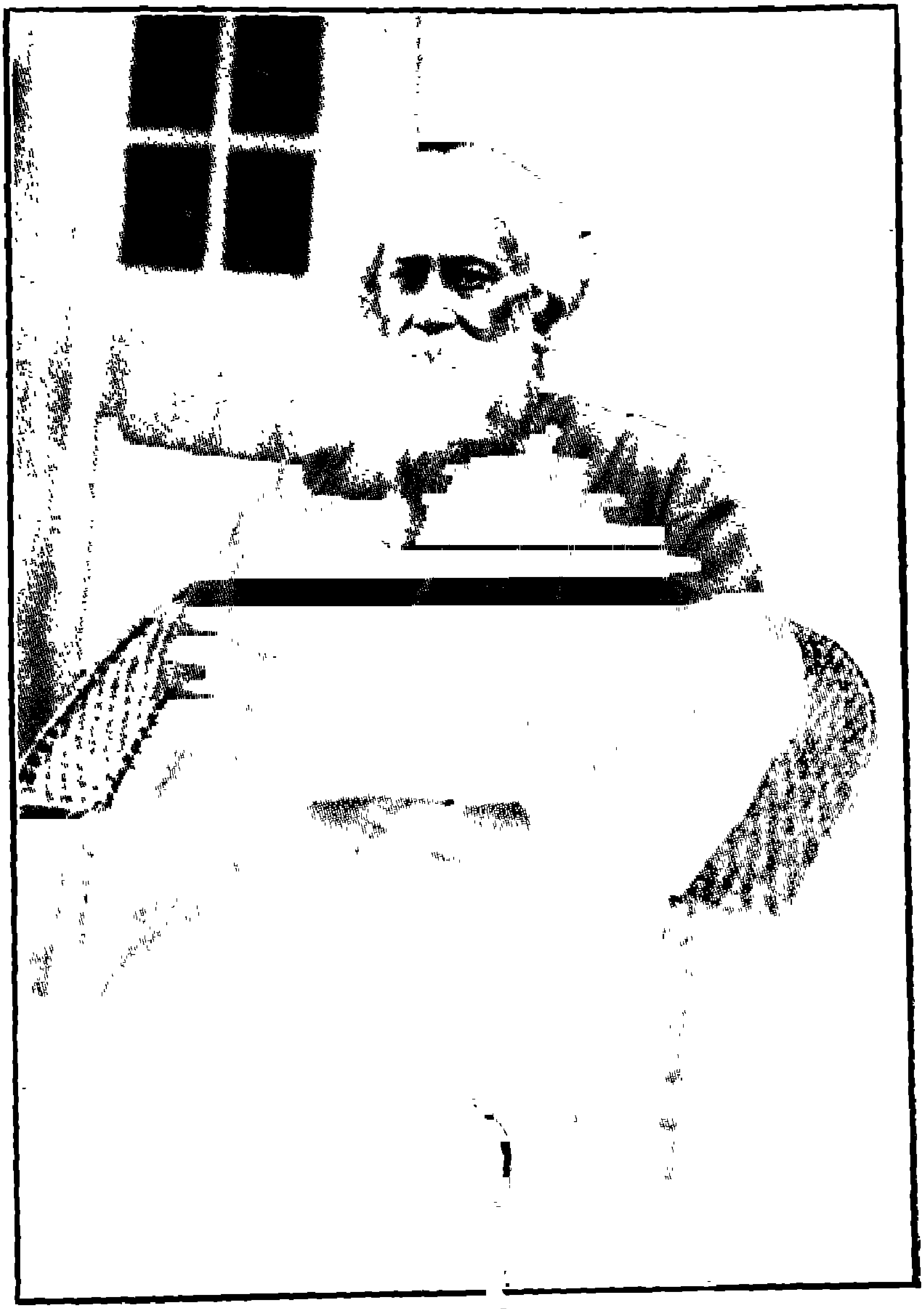

বক্তৃতাদানের জন্য কাশী যাত্রা করেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে একটি ডক্টরেট উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী কবি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করেন। অতঃপর কবি লাহোর গিয়া পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

শ্যামলী

শান্তিনিকেতনে কবির ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ দিন কবি তাঁহার নবনির্মিত মৃন্ময় গৃহ শ্যামলীতে প্রবেশ করেন। এই দিনেই কবির 'শেষ-সপ্তক' প্রকাশিত হয়।

২১শে মে কলিকাতায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

নোগুচির আগমন

৯ই নবেম্বর জাপানী কবি নোগুচি শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। পরে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন নোগুচি উহা সমর্থন করেন এবং কবি জাপানের এই কার্য্যের নিন্দা করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন।

১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় 'রাজা' অভিনীত হয় এবং কবি ঠাকুরদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

উত্তর ভারত ভ্রমণ

১১ই, ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কবির নূতন নৃত্য-নাট্য চিত্রাঙ্গদা অভিনীত হয়। অতঃপর কবি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। পাটনা

ও এলাহাবাদ হইয়া কবি দিল্লী গমন করেন। এই বয়সে অর্থসংগ্রহের ন্যায় পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে কবিকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া গান্ধীজী তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন এবং গান্ধীজীর কয়েকজন অনুরক্ত ব্যক্তি বিশ্বভারতীর জন্য কবিকে ৬০ হাজার টাকা দান করেন। দিল্লী হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ১৫ই জুলাই কলিকাতা টাইন হলে এক বিরাট জনসভা হয়। কবি ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং হিন্দু নেতারা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাঁহাদের অভিযোগ জানাইয়া যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন কবি তাহাতে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে কবির বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট্ উপাধি প্রদান করেন।

অক্টোবর মাসে আশুতোষ কলেজ হলে কবির আর একটি নৃত্য-নাট্য 'পরিশোধ' অভিনীত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে কবি বক্তৃতা করেন। এই উৎসবে মূল অভিভাষণ প্রদান করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আর কোন বে-সরকারী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। এই উপলক্ষ্যে আরও একটি প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করা হয়। কবি বাঙ্গলায় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন।

৩রা মার্চ্চ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম মহাসম্মেলনে কবি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৪ই এপ্রিল বাঙ্গলা নববর্ষের দিনে চীনা কনসাল শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ৭ই মে শান্তিনিকেতনে কবির সপ্ত-সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর কবি একমাস আলমোড়ায় যাপন করেন এবং সেখানে 'বিশ্ব-পরিচয়' লেখেন। জুলাই মাসে কিছুদিন তিনি উত্তরবঙ্গের জমিদারী পতিসারে কাটাইয়া আসেন।

কবি-সম্রাট

অঙ্গের ভারতী তীর্থ কবিকে কবি-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করে। ২রা ও ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় 'বর্ষামঙ্গল' অভিনীত হয়।

গুরুতর পীড়া

১০ই সেপ্টেম্বর কবি শান্তিনিকেতনে গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। কলিকাতা হইতে তাঁহার প্রিয় বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার আরও কতিপয় চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতন চলিয়া যান এবং চিকিৎসা ও সেবার দ্বারা কবিকে নিরাময় করিয়া তোলেন। কবি একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে অক্টোবর মাসে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। এখানে গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

লর্ড লোথিয়ান এবং লর্ড ও লেডী ব্রেবোর্ণ এই বৎসর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন।

চণ্ডালিকা অভিনয়

১৯৩৮ সালের ১লা মার্চ্চ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট্ উপাধি প্রদান করেন। ১৯শে মার্চ্চ সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা কলিকাতায় 'চণ্ডালিকা' অভিনয় করেন। কবি উহা দর্শন করেন। ২২শে মার্চ্চ কলিকাতায় গান্ধীজীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়।

শান্তিনিকেতনে ৭ই মের পরিবর্ত্তে ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ,কবির ৭৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জন্মোৎসবের তারিখ পরিবর্ত্তন এই প্রথম।

কালিম্পং ও মংপুতে গ্রীষ্মকাল কাটাইয়া কবি ৫ই জুলাই শান্তি-নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে কবি এই সময় নাট্যরূপ দেন।

হিন্দী-ভবন

১৯৩৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শান্তি-নিকেতনে হিন্দী ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র বসু এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। সঙ্গীত ভবনের উদ্যোগে কলিকাতায় 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা' অভিনয় হয় এবং কবি এই অভিনয় দর্শন করেন। এবারও ১লা বৈশাখ কবির ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উৎসব শান্তিনিকেতনে সম্পন্ন হয়। অতঃপর কবি পুরী গমন করেন এবং সেখানে ৭ই মে তারিখে তাঁহার জন্মদিনে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়।

মহাজাতি সদন

১৮ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে কবি কলিকাতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশন

সিউড়িগ্রামে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কবি বক্তৃতা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর কবি মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এণ্ডরুজের পরলোক গমন

১৯৪০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী কবি সিউড়ীতে একটি শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। মার্চ্চ মাসে বাঁকুড়ায় গিয়া কবি একটি মাতৃ নিবাস ও শিশুকল্যাণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন।

৫ই এপ্রিল কলিকাতায় কবির প্রিয় বন্ধু চার্লস এণ্ডরুজ পরলোকগমন করেন।

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) শান্তিনিকেতনে বিনা আড়ম্বরে কবির অশীতিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ উপাধি দান

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট্ উপাধি দানের সিদ্ধান্ত করেন। এই উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে ৭ই আগষ্ট শান্তিনিকেতনে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গয়ার, সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হেণ্ডারসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া কবি সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দনের উত্তর দেন।

আবার গুরুতর পীড়া

এই উৎসবের পর কবি ১৯শে সেপ্টেম্বর কালিম্পং গমন করেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর সেখানে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২৯শে তারিখে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। দেড় মাস কলিকাতায় শয্যাগত থাকিয়া ১৮ই নবেম্বর কবি শান্তিনিকেতন চলিয়া যান।

সভ্যতার সঙ্কট

১৯৪১ সালের ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, শান্তিনিকেতনে কবির ৮১তম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষ্যে কবি 'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক একটি মর্ম্মস্পর্শী বাণী দেন।

কবি লেখেন, "মস্কাও সহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্য্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, দেখেছিলেম সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থ-সম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসন ব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে,—এক ইংরেজ আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত ক'রে দিয়ে তাকে চিরকালের মত নিৰ্জ্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি—এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে

কিছু পড়েছি। এই রকম গবর্ণমেন্টের প্রভাব কোন অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।

"ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।······ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব দিগন্ত থেকেই।"

রোগশয্যায়

৮ই মে সমগ্র ভারতবর্ষে কবির জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। কবির জন্মদিবসে 'জন্মদিনে', 'গল্প-সল্প' এবং 'ছেলেবেলার' ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ৪ঠা জুন ভারতবাসীদের প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাবে কবি এক তেজোদৃপ্ত বিবৃতি দেন। এই চিঠিতে কবি ভারতে বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করেন। জুন মাসের শেষের দিকে কবি অসুস্থ হইয়া

পড়েন। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে। তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। ৩০শে জুলাই কবির দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়।

অস্ত্রোপচারের দিন কবি নিম্নলিখিত কবিতাটি মুখে মুখে বলিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা লিপিবদ্ধ করা হয়—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্তেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তা'রে
যে পথ দেখায়
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক্ অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে' বলে বিড়ম্বিত ;
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এইটিই কবির শেষ কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ

মহাপ্রয়াণ

অস্ত্রোপচারের পর প্রথম দুই দিন কবির অবস্থার একটু উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু দুইদিন পরেই উহা আবার খারাপ হইয়া উঠে। ৫ই আগষ্ট হইতে তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া ওঠে। অবশেষে ৭ই আগষ্ট রাখী পূর্ণিমার দিনে তিনি দেহ রক্ষা করিলেন। এই রাখীকেই তিনি জাতির শক্তির, মিলনের, মুক্তির প্রতীক করিয়া তুলিবার জন্য রাখীবন্ধন দিবস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; বিদায় কালেও জাতিকে হয়ত সেই নির্দ্দেশই তিনি দিয়া গেলেন।

উত্তী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী

১৮৭৮—কবি কাহিনী (কবিতা)।
১৮৮০—বনফুল (কবিতা)।
১৮৮১—বাল্মীকি প্রতিভা (গীতি নাট্য), ভগ্নহৃদয় (নাটক), ইউরোপ প্রবাসীর পত্র।
১৮৮২—সন্ধ্যা সঙ্গীত (গীতি কবিতা), কালমৃগয়া (গীতি-নাট্য)।
১৮৮৩—বৌ ঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস), প্রভাত সঙ্গীত (গীতি কবিতা), বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)।
১৮৮৪—ছবি ও গান (কবিতা), প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাটক), নলিনী (নাটক), শৈশব সঙ্গীত (কবিতা), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (কবিতা)।
১৮৮৫—রামমোহন রায় (পুস্তিকা), আলোচনা (প্রবন্ধ পুস্তক), রবিচ্ছায়া (গান)।
১৮৮৬—কড়ি ও কোমল (কবিতা)।
১৮৮৭—রাজর্ষি (উপন্যাস), চিঠিপত্র।
১৮৮৮—সমালোচনা (প্রবন্ধ পুস্তক), মায়ার খেলা (গীতি নাট্য)।
১৮৮৯—রাজা ও রাণী (নাটক)।
১৮৯০—বিসর্জ্জন (নাটক), মন্ত্রী অভিষেক (বক্তৃতা), মানসী (কবিতা)।
১৮৯১—ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী।
১৮৯২—চিত্রাঙ্গদা (নাটক), গোড়ায় গলদ (নাটক)।
১৮৯৩—গানের বই ও বাল্মীকি প্রতিভা, ইউরোপ যাত্রীর পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড।
১৮৯৪—সোনার তরী (কবিতা), ছোট গল্প, চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ (নাটক)।
১৮৯৫—বিচিত্র গল্প, ১ম ও ২য় খণ্ড, কথাচতুষ্টয় (গল্প), গল্প সপ্তক।
১৮৯৬—নদী (কবিতা), চিত্রা (কবিতা), কাব্য গ্রন্থাবলী, এই কাব্য গ্রন্থাবলীতে মালিনী নাটক ও চৈতালি কবিতাগুচ্ছ সন্নিবেশিত হইয়াছিল।
১৮৯৭—বৈকুণ্ঠের খাতা (নাটক)।
১৮৯৮—পঞ্চভূত (প্রবন্ধ)।
১৮৯৯—কণিকা (কবিতা)।
১৯০০—কথা (কবিতা), কাহিনী (কবিতা), কল্পনা (কবিতা), ক্ষণিকা (কবিতা)।
১৯০১—নৈবেদ্য (কবিতা)।
১৯০৩-৫—চোখের বালি (উপন্যাস), কর্ম্মফল (গল্প), কাব্যগ্রন্থ (৯ খণ্ড), (এই কাব্যগ্রন্থে স্মরণ ও শিশু সন্নিবেশিত হয়। পৃথক ভাবে পুস্তকাকারে এই দুটি পরে প্রকাশিত হয়)। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, ইহাতে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ স্থান লাভ করে, উহা পৃথকভাবে পরে প্রকাশিত হয়। স্বদেশী সমাজ (প্রবন্ধ), শিবাজী উৎসব (কবিতা)

১৯০৬—আত্মশক্তি (রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা), ভারতবর্ষ (রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা), খেয়া (কবিতা), নৌকাডুবি (উপন্যাস)।

১৯০৭—বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রাপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুক।

১৯০৮—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (নাটক), প্রহসন (বৈকুণ্ঠের খাতা ও গোড়ায় গলদ একত্রে), রাজাপ্রজা (রাজনৈতিক প্রবন্ধ), সমূহ (রাজনৈতিক প্রবন্ধ), স্বদেশ (রাজনৈতিক প্রবন্ধ), সমাজ (প্রবন্ধ), শারদোৎসব (নাটক), শিক্ষা (প্রবন্ধ), মুকুট (নাটক)।

১৯০৯—শব্দতত্ত্ব (প্রবন্ধ), ধর্ম্ম (প্রবন্ধ), শান্তিনিকেতন (৮ খণ্ড, উপদেশ), প্রায়শ্চিত্ত (নাটক), চয়নিকা।

১৯১০—রাজা (নাটক), গোরা (উপন্যাস), শান্তিনিকেতন (৯ম হইতে ১১শ খণ্ড), গীতাঞ্জলি (গীতি কবিতা)।

১৯১১—শান্তিনিকেতন (১২শ ও ১৩শ খণ্ড)।

১৯১২—ডাকঘর (নাটক), জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, অচলায়তন (নাটক), গল্প-চারিটি।

১৯১৪—উৎসর্গ (কবিতা), গীতিমাল্য, গীতালি।

১৯১৫-১৬—কাব্যগ্রন্থ (কবিতা ও নাটক সংগ্রহ, দশ খণ্ড), শান্তিনিকেতন (১৪শ হইতে ১৭শ খণ্ড), গল্পসপ্তক।

১৯১৬—ফাল্গুনী (নাটক), চতুরঙ্গ (উপন্যাস), ঘরে বাইরে (উপন্যাস), বলাকা (কবিতা), পরিচয় (প্রবন্ধ), সঞ্চয় (প্রবন্ধ)।

১৯১৭—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (বক্তৃতা)।

১৯১৮—পলাতকা (কবিতা)।

১৯১৯—জাপান যাত্রী।

১৯২০—অরূপ রতন (নাটক)।

১৯২১—ঋণশোধ (নাটক), শিক্ষার মিলন (বক্তৃতা), সত্যের আহ্বান (বক্তৃতা)।

১৯২২—শিশু ভোলানাথ (কবিতা), মুক্তধারা (নাটক), লিপিকা (গদ্য-কাব্য)।

১৯২৩—বসন্ত (গীতিনাট্য)।

১৯২৫—পূরবী (কবিতা), গৃহপ্রবেশ (নাটক), প্রবাহিনী (গান)।

১৯২৬—রক্তকরবী (নাটক), শোধবোধ (নাটক), লেখন (কবিতা)।

১৯২৮—শেষ রক্ষা (নাটক)।

১৯২৯—পরিত্রাণ (নাটক), যাত্রী (পত্রাবলী), যোগাযোগ (উপন্যাস), শেষের কবিতা (উপন্যাস), মহুয়া (কবিতা), তপতী (নাটক)।

১৯৩০—ভানুসিংহের পত্রাবলী।

১৯৩১—রাশিয়ার চিঠি, বনবাণী (কবিতা), সঞ্চয়িতা।

১৯৩২—পরিশেষ (কবিতা), পুনশ্চ (কবিতা), কালের যাত্রা (নাটক)।

১৯৩৩—দুই বোন (উপন্যাস), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (বক্তৃতা), শিক্ষার বিকী(বক্তৃতা), তাসের দেশ (প্রহসন), চণ্ডালিকা (নাটক), মানুষের ধর্ম্ম (বক্তৃত. বাঁশরী (নাটক), বিচিত্রিতা (সচিত্র কবিতা)।

১৯৩৪—মালঞ্চ (উপন্যাস), চার অধ্যায় (উপন্যাস)।

১৯৩৫—শেষ সপ্তক (কবিতা), বীথিকা (কবিতা), সুর ও সঙ্গতি (চিঠিপত্র)।

১৯৩৬—পত্রপুট (কবিতা), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, ছন্দ (প্রবন্ধ), শ্যামলী (কবিতা জাপানে-পারস্যে, সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ), প্রান্তনী (বক্তৃতা)।

১৯৩৭—খাপছাড়া (কবিতা), কালান্তর (প্রবন্ধ), সে (শিশুপাঠ্য গল্প), বিশ্ব-পরিচয় ছড়াছবি।

১৯৩৮—পথে ও পথের প্রান্তে (পত্র), সেঁজুতি (কবিতা), বঙ্গভাষা পরিচয় (প্রবন্ধ) প্রহাসিনী (কবিতা)।

১৯৩৯—চণ্ডালিকা (নৃত্যনাট্য), পথের সঞ্চয় (চিঠি), রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড।

১৯৪০—নবজাতক (কবিতা), সানাই (কবিতা), চিত্রলিপি (ছবির এলবাম) ছেলেবেলা, তিন সঙ্গী (গল্প), রোগশয্যায় (কবিতা)।

১৯৪১—আরোগ্য (কবিতা), জন্মদিনে (কবিতা), সভ্যতার সঙ্কট (বক্তৃতা) গল্পসল্প (শিশুপাঠ্য গল্প)।